প্রথম সংস্করণ : এক হাজার

প্রকাশক : ডি মেহরা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক : পি. জি. গোস্বামী
রপানন্দা প্রেস
১৩৮।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : নরেন্দ্রনাথ দত্ত

আলব্যার কামু রচিত মূল ফরাসী গ্রন্থ Le Chute (The fall)-এর বাংলা অনুবাদ
Messieurs Libraire Gallimard-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত।
বাংলা অনুবাদের সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

"অনেকে ভয়ানক অপমানিত হ'ল, মারাত্মক-রকম--'এ-যুগের নায়ক' নামধারী এক দুশ্চরিত্রকে আদর্শরূপে খাড়া ক'রে রাখবার অপরাধে; অন্যেরা সুকৌশলে ধ'রে ফেলল যে লেখক নিজেকে আর তাঁর পরিচিত মহলকেই চিত্রিত করেছেন।...মান্যবরেষু, 'এ-যুগের নায়ক' চিত্রই বটে, তবে ব্যক্তি বিশেষের নয়, গোটা একটি যুগের পুঞ্জীভূত পাপেরই তা পূর্ণ প্রকাশ।"

—লেরমন্তফ

# পতন

## এক

মঁসিয়্য, কিছু যদি না মনে করেন, আপনাকে সাহায্য করতে পারি ? এই কারবারের প্রাণস্বরূপ ওই গোরিলার মত স্বনামধন্য লোকটির কাছে হয়ত আপনার প্রয়োজনের কথা আপনি ভালভাবে বোঝাতেই পারবেন না। লোকটা আদৌ ডাচ ছাড়া অন্য-কিছু জানেই না। হয়ত আমার মধ্যস্থতা ছাড়া ওর পক্ষে সমঝানোই মুস্কিল হবে যে আপনি জিন্ খাবেন। দেখুন, মনে হল যেন, ও আমার কথা বুঝতে পেরেছে; ঘাড়টা কাৎ করল, অর্থাৎ আমার যুক্তিতে ওর সায় আছে। ওই তো, চলতে শুরু করল ; ওই তো, তৎপর হয়ে উঠেছে যত্নে-আয়ত্ত আত্ম-সচেতনতায়। আপনার কপাল ভাল ; গজ্‌গজ্ করছে না লোকটা। যদি কারো হুকুম তামিল করতে ওর আপত্তি থাকে, তবে ও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে থাকে। কেউ আর ওজর করে না। আপন মেজাজের উপর প্রভুত্বটা, বৃহত্তর জানোয়ারদের একটি বিশেষ সুবিধে। আচ্ছা, এবার চলি, মঁসিয়্য, আপনাকে সাহায্য করতে পেরে কৃতার্থ হলাম। ধন্যবাদ ; আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতাম, যদি জানতাম আপনার বিরক্তিভাজন হব না। ভারি সহৃদয় আপনি। বেশ, তবে আমার গেলাসটাও এখানেই নিয়ে আসি।

ঠিক বলেছেন। লোকটার মূক স্বভাবে কান যেন বধির হতে চলল। যেন আদিম কোন জঙ্গলের মৌনতা, প্রতি-পদে যার আশঙ্কার অবধি নেই। সভ্যজগতের ভাষাগুলিকে তাচ্ছিল্য করবার ওর এই একগুঁয়ে ব্রত দেখে মাঝেমাঝে আমি তাজ্জব বনে যাই। ওর কাজ

হল, সব জাতির নাবিকদের তোয়াজ করা ওর এই আমস্টারডাম শহরের পানাগারে। কেন জানি না, পানাগারের নাম রেখেছে 'মেক্সিকো নগরী'। এমন কাজে ওর এই অজ্ঞতা ভারি অস্বস্তিজনক নয় কি? একটা ক্রো-মাঞন্ মানুষকে যদি বাবেলের দুর্গে রাখা হত তার অবস্থাটা কেমন হত, ভাবুন দেখি! যেন জল-ছাড়া মাছ। তবু এ লোকটা জানে না, নির্বাসনের জ্বালা; বেশ আছে নিজের মতো, কোনো কিছুর তোয়াক্কা রাখে না। ক্বচিৎ যে-কয়েকটি বাক্য এযাবৎ ওর মুখে শুনেছি তার মধ্যে একটি হল, ভাল লাগলে নাও, নইলে নিও না। কি নেবে, কি নেবে-না? বোধহয় ওই বন্ধুবরকে। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে এজাতীয় নির্ভেজাল জীব দেখলেই আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। যাদের নেশা বা পেশা হল মানবচিন্তা, তারা স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় মানুষের এই পূর্বপুরুষদের প্রতি। এদের অন্তত কোনো মারপ্যাঁচের মধ্যে সাধারণত থাকতে দেখা যায় না।

অবশ্য আমাদের এই হোটেলওয়ালার মারপ্যাঁচ কিছু কিছু আছে; ভারি সেয়ানা, তলায় তলায় ও সবকিছু করে। ওর সামনে যাকিছু বলা হয়, না-বুঝতে পারবার ফলে বিশ্বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে ওর চরিত্র। সেই হচ্ছে ওর ওই ওপর-আভিজাত্যের উৎস; কেমন যেন ওর সন্দেহ, মানুষের মধ্যে সবই নিখুঁত নয়! কাজেই ওর ব্যবসার বাইরের কোন কথা ওর সঙ্গে বলা দারুণ কঠিন। দেখুন না, ওর পেছনের ওই দেয়ালটায়, মাথার ঠিক ওপরেই, চৌকোণা দাগটা—একটা ছবি নামিয়ে ফেলবার দাগটা। এককালে ওখানে একটা ছবি ছিল বই-কি, চমৎকার একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন। ছবিটা ওখানে যেদিন টাঙান হয়, সেদিনও আমি এখানেই ছিলাম, নামিয়ে ফেলবার দিনও ছিলাম। দুবারই বহু-সপ্তাহ ধরে ভেবে-চিন্তে তবে লোকটা কাজে হাত দিয়েছিল, একই রকম সন্দিগ্ধ মনে। এদিক দিয়ে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে, সমাজই দায়ী ওর মনের সরলতা হরণ করবার দরুন।

ভুলবেন না, ওকে আমি মোটেই দোষী করছি না। ওর এই সন্দিগ্ধ চিত্তের আমি সমর্থন করি, এবং নিজেও ওর মতো হতে আপত্তি করতাম না যদি আমার দিল-দরিয়া মেজাজের সঙ্গে একটুও তা খাপ খেত। আমি কপালক্রমে কথাও যেমন বেশি বলি, দোস্তিতেও তেমনি পটু। নিজের ব্যবধান কি করে বজায় রাখতে হয় আমি জানলেও সুযোগ পেলেই বন্ধুত্ব পাতাতে আমি ওস্তাদ। যখন আমি ফ্রান্সে ছিলাম, বুদ্ধিমান কারো সাথে দেখা হওয়ামাত্র তার সঙ্গলাভের জন্য আমি লালায়িত হয়ে উঠতাম। তা যদি আপনি বোকামি বলেন····হুঁ, আপনি হাসছেন, আমার মুখের ওই 'যদি' শুনে। 'যদি' ব্যবহার করতে আমি ভারি ভালবাসি, আর ভালবাসি চোস্ত বুলিতে আলাপ করতে। বিশ্বাস করুন, আমার এ-দুর্বলতা আমি নিজেই অক্ষমণীয় মনে করি। আমি বিলক্ষণ জানি, রেশমী আণ্ডার অয়্যারের প্রতি অনুরাগ থাকলেই যে পা নোংরা হতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। তবু, রেশমের মতোই, কেতা দিয়ে অনেকে যে একজিমা ঢাকে, এ কথা অনস্বীকার্য। হাজার হলেও, মনে-মনে আমি বেশ স্বস্তি পাই যখন ভাবি, ভাষার অপব্যবহার করে যারা তারা অন্তত নিষ্কলুষ নয়। আচ্ছা, আচ্ছা, আর-একটু জিন্ খাওয়া যাক-না।

আম্স্টারডামে বেশ কিছুদিন থাকছেন নাকি? খাসা শহরটি, তাই না? মনোহর? কতকাল যে এই বিশেষণটি শুনি নি। বহু বছর হল, প্যারিস ছেড়ে-আসা অবধি শুনিনি অন্তত। তবু অন্তরের স্মৃতিশক্তি ভারি প্রখর, ভুলি নি আমি আমাদের রূপ-গরবিণী সেই রাজধানী, ভুলি নি তার পোস্তাগুলো। প্যারিস হচ্ছে বাস্তবিকই কুহকিনী, চল্লিশ লক্ষ ছায়ামূর্তির নিবাস এক মায়াপুরী। কি বললেন? গতবার গোনা হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ? তা, এতদিনে বাড়বে, আশ্চর্য কি! বাড়বে বই-কি। বরাবর আমার মনে হয়েছে, প্যারিসের অধিবাসীদের দুটিমাত্র নেশা আছে: বড বড ভাবধারা

নিয়ে মেতে থাকা, আর ব্যভিচার। বলতে গেলে, এ দুটি ওখানে গা-সওয়া ব্যাপার। তবু, আমাদের উচিত এ নিয়ে ছি-ছি না করা কারণ একমাত্র ওরাই তো এ পথের পথিক নয়, তামাম ইউরোপই এক-গোয়ালের গরু। এক-এক সময় ভাবি, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা না জানি কি-রূপেই আমাদের চিত্রিত করবে। আজকের মানুষের ব্যাখ্যা একটি বাক্যেই সম্পূর্ণ: ব্যভিচার করায় আর খবরের কাগজ পড়ায় এরা দক্ষ ছিল। এই শক্তিশালী ব্যাখ্যার পর আমার মনে হয় এ-বিষয়ে দ্বিতীয় কোনো কথা আর বলার প্রয়োজন হবে না।

না, না—ওলন্দাজদের কথা বলছি না; ওরা অনেক কম আধুনিক! সময় ওদের অফুরন্ত—ওই দেখুন না। কি আর ওদের কাজ? এখানে এই ক জন ভদ্রলোককে দেখছেন, এঁদের জীবিকা নির্বাহ হয় ওখানকার ওই ভদ্রমহিলাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্জিত অর্থে। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে ওঁরা প্রায় সবাই এখানে এসেছেন হয় মীথোম্যানিয়া, নয় মূর্খতার তাড়নায়। অর্থাৎ, কল্পনার আতিশয্য বা মন্দা-হেতু। মাঝে-সাঝে এঁরা রিভলভার বা ছোরা চালান পরস্পরের গায়ে; তাই বলে ভাববেন না যেন, এমনটি এঁরা আকছার করেন। এ-জীবনে এমনটি না-হওয়াই ব্যতিক্রম, তবু এ কাজ করতে ওদের সারা সত্তা কেঁপে ওঠে। তাসত্ত্বেও এঁরা অন্যদের তুলনায় ঢের বেশী নীতিপ্রিয়, অন্তত যারা পারিবারিক জীবনের গণ্ডিতে বসে তিলে তিলে ক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে যায়, তাদের চেয়ে ঢের ভাল। লক্ষ্য করে দেখেন নি—আমাদের সমাজ গড়েই যেন উঠেছে এমনি এক দেউলিয়া হবার উদ্দেশ্য নিয়ে। ব্রেজিলের নদীর সেই ছোট্ট মাছগুলোর কথা শুনে থাকবেন, যারা হাজারে হাজারে এসে অতর্কিতে স্নানার্থীকে এমনভাবে খুবলে খায় যে কয়েক নিমেষের মধ্যেই বাকী থাকে শুধু ধবধবে সাদা একখানা কঙ্কাল! এমনি হল ওদের সমাজের বিধান। আর-দর্শজনের মত স্বাস্থ্যকর জীবন তুমি যাপন করতে চাও কি?—'হ্যাঁ', আপনি বলবেন নির্ঘাৎ।

'না' কি কখনো বলা চলে? 'বহুৎ আচ্ছা। এই দেখ তোমার স্বাস্থ্যকর পথ। এই নাও চাকরি, এই নাও দারা-পুত্র-পরিবার, এই নাও সুনির্দিষ্ট বিশ্রাম।' তারপর শুরু হয় ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁতের আক্রমণ আপনার চামড়ায়, মাংসে; হাড়-সার হয়ে যান আপনি। না, না, এ আমার অন্যায়। কেন খামকা 'ওদের' সমাজ বলছি, কে জানে? হাজার হোক, এ 'আমাদেরই'। আর কেউ হয়তো এ সমস্যার সমাধান দেবে।

এই দেখুন, জিন্ এনে হাজির করেছে। আপনার সুখসমৃদ্ধি কামনা করি। দেখলেন, বেটা গোরিলাটা হাঁ করল, অর্থাৎ আমায় ডাক্তার বলে সম্বোধন করল। এসব দেশে হয় সবাই ডাক্তার, নয় তো সবাই প্রফেসর। এরা অপরকে শ্রদ্ধা করতে জানে, কতক সহৃদয়তাবশত, কতক বিনয়বশত। ঘৃণাটা অন্তত এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নয়। আসল কথা, আমি মোটেই ডাক্তার নই। যদি জানতে চান তো বলি, এখানে আসার আগে আমি ছিলাম আইনজ্ঞ। এখন, আমি একজন অনুতপ্ত-বিচারক।

কিছু না মনে করেন তো আমার পরিচয় দিই: আপনারই হিতার্থে এখানে বহাল রইলাম আমি, খোদ্ জাঁ-বাপ্তিস্ত ক্লামাঁস! আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারি সুখী হলাম। কি করেন আপনি? ব্যবসা নিশ্চয়? ওই-জাতীয় কিছু? বেশ বলেছেন! বেশ সুদূরদর্শী জবাবটা: আমাদের জীবনটা সর্বাংশেই তো 'ওই-জাতীয় কিছু'। এবার একটু গোয়েন্দাগিরি ফলাই আপনার অনুমতি নিয়ে। দেখে আপনাকে আমারই বয়সী বা ওই-জাতীয় কিছু মনে হয়, বছর চল্লিশ বয়সের ঝানু লোকের দৃষ্টি আপনার—বোঝা যায়, দেখেছেন আপনি তামাম দুনিয়ার সবকিছুই বা ওই-জাতীয় কিছু; আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ পরিপাটি বা ওই-জাতীয় কিছু, অর্থাৎ আমার দেশবাসী বলে মনে হয় আপনার পোশাক দেখে, বেশ সুখী হাত আপনার। অর্থাৎ অভিজাত-সমাজের লোক বা ওই-জাতীয় কিছু আপনি! শিক্ষিত,

ধনী আপনি! 'আমার মুখে 'যদি'-র প্রয়োগ শুনে আপনি হাসলেন; তাতেই দুই দিক দিয়ে আপনার শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, প্রথমত 'যদি'-প্রয়োগ করাটা আপনি লক্ষ্য করলেন, দ্বিতীয়ত এ প্রয়োগ আপনার রুচিতে হীন ঠেকল। সবশেষে, আমি আপনার চোখে হাস্যকর ঠেকছি। বিনা গর্বে আমি বলতে পারি—এ থেকেই আমি বুঝছি আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা। সুতরাং আপনি হলেন ওই-জাতীয় কিছু, যারা···যাক্‌গে ও কথা। সম্প্রদায়ের চেয়ে বিভিন্ন পেশার প্রতিই আমার বেশী অনুরাগ। দুটি-মাত্র প্রশ্ন আমায় করবার স্বাধীনতা দিন, উত্তর দেবেন না যদি তা আপনার কাছে ধৃষ্টতা মনে হয়। আপনার ধনসম্পত্তি বলতে কিছু আছে কি? আছে? বাঁচোয়া! তার অংশ-বিশেষ কি দরিদ্রের কল্যাণার্থে নিয়োগ করেছেন? না? তবে আপনি হলেন আমার মতে স্যাডিউসি-সম্প্রদায়ভুক্ত।* অবশ্য যদি শাস্ত্র আপনার পড়া না-থাকে, এ কথার তাৎপর্য আপনি বুঝবেন না। কি বললেন? বুঝতে পেরেছেন? তবে আপনার শাস্ত্র পড়া আছে দেখছি। বাঃ, ভারি ঈপ্সিত লাগছে আপনার সঙ্গ।

আমার কথা, কি আর বলব?····নিজেই বুঝতে পারছেন। আমার এমন চেহারা, এই কাঁধ, আর এই মুখ—যা লোকে প্রায়ই বলত লাজুক লাজুক লাগে—দেখে মনে হয় ফুটবল-খেলোয়াড়, তাই না? তবে যদি আমার কথাবার্তা শোনেন, স্বীকার করবেনই, আমার বুদ্ধিবৃত্তি যেন সূক্ষ্মতারই ধার-ঘেঁষা। আমার এই ওভারকোটটা যে-উটের লোমে বানানো, উটটা হয়তো ঘেয়ো ছিল; কিন্তু আমার হাত-দুটি দেখুন, প্রসাধিত। আপনার মত আমিও দুনিয়াদারি করেছি, তবু, স্রেফ আপনার হাবভাব দেখে, আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই মনে, আপনার ওপর নির্ভর করা চলে। তবুও, আমার এই সযত্ন-অর্জিত ব্যবহার এবং শৌখীন বাচনভঙ্গীর তোয়াক্কা না-রেখেই

* পরলোকে অবিশ্বাসী ইহুদী (New Testament)—অনুবাদক।

যাতায়াত করি আমি জিডাইকের খালাসীদের পানাগারে। না, আপনি ভেবে পেলেন না আমার পেশা কি। ইতিপূর্বেই আপনাকে আমি বলেছি, আমি একজন অনুতপ্ত-বিচারক। একটি বিষয়ে আমি নির্ঝঞ্ঝাট : বিত্তের বালাই আমার নেই। তবু, এককালে আমি ধনী ছিলাম। উঁহু, দয়াদাক্ষিণ্যে তিলমাত্র দিই নি কখনো। এ থেকে কি প্রমাণিত হয়? আমিও একজন স্যাডিউসি ছিলাম।…ওই শুনছেন, ফগ্-হর্ন বাজছে বন্দরে? আজ রাতে সুইডারসি-র উপকূল দারুণ কুয়াসায় ঢেকে যাবে।

এর মধ্যেই উঠছেন? আপনাকে দেরী করানোর দরুন মাফ চাইছি। না না, দোহাই আপনার; দাম আমিই মিটিয়ে দেব। আপনাকে দিতে দেব না। এই 'মেক্সিকো সিটি' হোটেলটা আমার ভারি ভাল লাগে; এখানে আপনাকে আপ্যায়িত করতে পেরে অত্যন্ত প্রীত হলাম। কালও আমি এখানে থাকব, রোজ সন্ধ্যাতেই থাকি যেমন; আর আপনি যদি আমায় আপ্যায়িত করতেই চান কাল, সানন্দে আমি তা গ্রহণ করব। কোন্ পথে বাড়ী ফিরছেন?… বেশ।…যদি কিছু মনে না করেন তো আমার পক্ষে আপনাকে ওই বন্দর অবধি পৌঁছে দেওয়া মোটেই কঠিন হবে না। ইহুদী পাড়া দিয়ে যেতে যেতে আমাদের পথে পড়বে সুন্দর সুন্দর তরুরাজি-শোভিত রাজপথ যেখানে দেখতে পাবেন গাড়ী-বোঝাই ফুলের বেসাতি আর এমন হৈ-চৈ শুনবেন, মনে হবে বুঝি বাজ পড়ছে। অমনি এক রাস্তায় আপনার হোটেল, দাম্‌রাক! চলুন, আপনি আগে চলুন। আমি থাকি ইহুদী পাড়ায়—আর-কি যতদিন-না হিটলার-পন্থী ভায়ারা এসে এদের কচুকাটা করল, ততদিন এই নামেই ও-পাড়া পরিচিত ছিল। কি ঝেঁটানই ঝেঁটিয়েছিল! পঁচাত্তর হাজার ইহুদীকে নির্বাসিত কিংবা নিহত করেছে রাতারাতি একেবারে; যাকে বলে ভ্যাকাম্-ক্লিনিং! এদের তৎপরতা আমার ভারি ভাল লেগেছিল, ভারি ভাল ওই রীতি-মাফিক অধ্যবসায়! বৈশিষ্ট্যের

সুপারিশ না থাকলে বাধ্য হয়েই শরণ নিতে হয় কোন রীতির। এ-ক্ষেত্রে সে-রীতি যে অদ্ভুত ফলপ্রসূ হয়েছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, আর আমার নিবাস ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জঘন্যতম এক অপরাধের উৎসস্থলে। এ-সুবাদেই বোধহয় ওই গোরিলাটা আর ওর সন্দিগ্ধ মনটার নাগাল পেতে আমার অসুবিধে হয় না। এ-সুবাদেই আমি আমার স্বভাববিরুদ্ধ যা খুশি নিজেকে দিয়ে বোধহয় করাতে পারি। যখনি নতুন কোন মুখ আমার নজরে পড়ে, অমনি আমার মনে শুনি এক বিপদসূচক সঙ্কেত। 'সাবধান! ধীরে, অতি ধীরে!' যত প্রবল, আকর্ষণই হোক না-কেন, আমি নিজেকে সংযত করে নিই।

জানেন, আমাদের অখ্যাত গাঁয়ে একবার প্রতিশোধ নিতে এসে এক জার্মান অফিসার দয়া করে এক বুড়ীকে জিজ্ঞেস করেছিল, জামিন-স্বরূপ তার দুই ছেলের কোন্‌টিকে আগে হত্যা করা হবে? বেছে নিতে হবে!—ভেবে দেখুন কাণ্ডটা! এটি আগে? না, ওটি আগে। আর নিজে চোখে তাকে তা দেখতে হবে দাঁড়িয়ে! যাক গে ওকথা মঁসিয়্য, তবু, বিশ্বাস করুন, জীবনে তাজ্জব বনবার সুযোগ যে-কোনো পথে আসতে পারে। একটি অপাপবিদ্ধ চরিত্রের খবর আমি রাখি, যার ত্রিসীমানায় শঙ্কা কখনো ঘেঁসতে দিত না সে। স্বেচ্ছাকামী শান্তিপ্রিয় লোক সে, মানুষ-পশু সবাইকে সে সমানভাবে ভালবাসত। সুদুর্লভ চরিত্রের লোক, নিঃসন্দেহে বলতে পারি। ইউরোপে শেষবার যখন ধর্মযুদ্ধ বাধল, ও গিয়ে আশ্রয় নিল পল্লী-অঞ্চলে। বাড়ীর চৌকাঠে লিখে রাখল, 'যে-দেশ থেকেই তুমি এসে থাক, ভেতরে এস, আন্তরিক আতিথ্য গ্রহণ কর।' এই উদার নিমন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত কে গ্রহণ করল, বলতে পারেন? একদল সৈন্য ভেতরে ঢুকল, দিব্যি আয়েস করে বাসা বাঁধল, বন্ধুটির নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে তার ইহলীলা সাঙ্গ করে দিল।

মাফ করবেন, মাদাম! যাক, ভাগ্যিস আমার কথার একবর্ণও উনি বুঝতে পারেন নি। এত লোক আজ বার হয়েছে, বাপ! তাও

যদি না একঘেয়ে বৃষ্টি পড়ত দিনরাত, উপরো-উপরি কয়দিন। এই দারুণ আঁধারে একমাত্র সান্ত্বনা—জিন্। পান করবার সাথে সাথে কেমন এক সোনালী, তামাটে-রঙের আলো মনের পটে জ্বলে ওঠে, লক্ষ্য করেছেন? জিন্ খেয়ে গা-টা যখন বেশ গরম হয়ে ওঠে, শহরময় তখন পায়চারি করে বেড়াতে খাসা লাগে। রাতের পর রাত আমি পায়চারি করে বেড়াই, অবিশ্রাম স্বপ্ন দেখি আর আপন-মনেই বকে চলি। এই যেমনটি আজ সন্ধ্যায় করছি—ভয় হচ্ছে, আপনার মাথা না ধরিয়ে দিই। ধন্যবাদ, ভারি সদাশয় আপনি। কথার এই স্রোত আমি সামলাতে পারি না, মুখ খুলতে না খুলতে কথার পর কথা ঝরে পড়ে। তাছাড়া, এ দেশটাই প্রেরণা দেয় আমায় সবচেয়ে বেশি। পথে পথে এই জনসমুদ্র আমার ভারি ভাল লাগে, স্বল্পপরিসরে বাড়ী, ঘর-দোর, ক্যানাল, কুয়াসার পাড়ে-গাঁথা, হিমশীতল মাটি, আর ফুটন্ত সমুদ্র। আমার ভারি পছন্দ এ জায়গাটা, দ্বৈত এর অস্তিত্ব। মনে হয় এখানে তো আছিই, অন্যত্রও যেন আছি।

ঠিক বলি নি? ভিজে ফুটপাথের ওপর পথিকদের সজোর পদক্ষেপ শুনে, সোনালী-রঙের হেরিং আর শুকনো-পাতার রঙের গয়না-গাটির দোকানে ওদের চিন্তাকুল মুখে যাতায়াত করতে দেখে আপনি বুঝি ভাবছেন ওরা এখন এখানেই আছে? তবে আর-দশজনের থেকে আপনার পার্থক্য কোথায়? এদের দেখে আপনি ভেবেছেন এরা বুঝি সবাই দালাল আর ব্যবসায়ী যারা একাধারে সিন্দুকের মোহর গুনছে আর পরলোকের ধান্ধায় আছে, যাদের জীবনের একমাত্র কবিতা হচ্ছে কালে-ভদ্রে শরীরতত্ত্বের ওপর বক্তৃতা শুনতে যাওয়া। তাও যদি মাথার চ্যাপটা হ্যাটগুলো এক মুহূর্তও খুলত! ভুল, মঁসিয়্য, ভুল। দেখুন না, আমাদের পাশে পাশেই তো ওরা চলছে, তবু মন ওদের কোথায় পড়ে আছে, দেখুন: ওদের মাথার ওপরে লাল আর সবুজ যে দোকানের সাইন্‌গুলো,

তারই পরিবেশে নিওন্, জিন্ আর পিপারমিন্ট-প্রসূত ধোঁয়ায় ওদের মন মশগুল। হল্যাণ্ড দেশটাই একটা স্বপ্ন, মঁসিয়্য, সোনা আর ধোঁয়ার স্বপ্ন—সারাটা দিন ধোঁয়ায় ঢাকা, আর রাতটা সোনায় সোনায় ছাওয়া। আর দিন নেই, রাত নেই, সেই স্বপ্নের ভীড়ে জটলা করছে এইসব লোয়ঁাগ্রিনের দল, উচু হ্যাণ্ডেলওয়ালা কালো সাইকেলে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে চলেছে, মৃত্যুপথযাত্রী রাজহাঁসের দল—সারা দেশময় চরছে, সমুদ্রতীরে, ক্যানেল-বরাবর, সর্বত্র। মাথা-ভবতি তামাটে-রঙের মেঘ নিয়ে ওরা স্বপ্ন দেখে যায়; ঘুরে-ঘুরে সাইকেল চালিয়ে বেড়ায়, যায় প্রার্থনা করতে, কুয়াসাব মাঝে, সোনালী ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্নের মাঝে চলে বেড়ায়। তখন আর ওরা এখানে থাকে না। হাজার হাজার মাইল দূরে মন ওদের চলে যায়, হয়তো জাভায়, কোন্ এক অচেনা দ্বীপে। ওদের দোকানের জানালাগুলো ওরা যেসব ভীষণদর্শন ইন্দোনেশীয় দেব-মূর্তি দিয়ে সাজিয়েছে—তাদের কাছেই ওবা প্রার্থনা কবে। ওই দেখুন, মূর্তিগুলো কি রাজকীয় বাঁদুরে কায়দায় বসে আছে, এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে সাইন-বোর্ডের ওপর, থাকে-থাকে-গাঁথা ছাদের ওপর, ঘরমুখো এই বিদেশীদেব ওরা যেন মনে করিয়ে দিতে চায় যে হল্যাণ্ড খালি বণিকদেব ইউরোপই নয়, হল্যাণ্ড হল সেই সমুদ্র যে-সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেওয়া যায় সিপাঙ্গোব পথে, আব সেইসব দ্বীপ-অভিমুখে যেখানে মানুষ মরে উন্মাদ হয়ে, আনন্দে ডগমগ করতে করতে।

নাঃ, আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছি! যেন ওকালতি করছি! মাফ করবেন। অভ্যাস, মঁসিয়্য, পেশা; অবশ্য আপনাকে এই শহরের পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবার বাসনাও, সেইসাথে আপনাকে বহু গোপন তথ্যের সন্ধান দেবার লোভ এজন্য দায়ী! এখানে আমরা জীবনের মর্মস্থলেই আস্তানা গেড়েছি। লক্ষ্য করে দেখেছেন, আমস্টারডামের এই সমকেন্দ্রিক বহুবৃত্তাকার ক্যানেলগুলি দেখে নরকের বৃত্তগুলির কথা মনে পড়ে যায়? অবশ্য মধ্যবিত্তদের নরক, যেখানে ভীড় করে

আছে দুঃস্বপ্নেরা! বাইরে থেকে ভেতর দিকে যত যাওয়া যায়, জীবন—আর তার পাপসম্ভার—ঘন হয়ে ওঠে ক্রমেই, হয়ে ওঠে আঁধারতর। এখানে এসে পৌঁছেছি আমরা কেন্দ্রের বৃত্তটিতে। অর্থাৎ—র বৃত্তে!…কি? আপনি তা জানতেন? হ্যা খোদা, আপনি ক্রমেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছেন, মঁসিয়্য! কেন আমি ইউরোপের উত্তরতম প্রদেশে দাঁড়িয়ে বলছি, এটাই সবকিছুর কেন্দ্রস্থল—তা আপনি তবে বুঝেছেন? কোন সংবেদনশীল ব্যক্তির পক্ষে এসব আজব কথা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু খবরের কাগজ পড়া আর ব্যভিচার করা অবধি যাদের দৌড়, তারা অতটা বুদ্ধিমান নয়। ইউরোপের চতুষ্কোণ থেকে এসে তারা থমকে দাঁড়ায় এই সমুদ্রের ধারে, বেশ্যাপাড়ার সামনে। শোনে তারা কুয়াসার সঙ্কেত; কুয়াসার মাঝে হন্যে হয় নৌকোর ছায়া খুঁজতে খুঁজতে, তারপর ক্যানেলের পথে মোড় নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘরে ফেরে। হাড়ে হাড়ে তুমুল কাঁপুনি নিয়ে জোটে তারা এই 'মেক্সিকো সিটি' সরাইয়ে, হাজার ভাষায় চায় জিন্। কাজেই, এখানেই আমি তাদের পথ চেয়ে ওত পেতে থাকি।

বেশ মঁসিয়্য, শ্যার কঁপাত্রিয়োত*, কাল আবার দেখা হবে। না, এবার আপনি নিজেই বাড়ীর পথ চিনে অনায়াসে যেতে পারবেন; আপনাকে আমি ওই ব্রিজটা অবধি পৌঁছে দিয়ে আসব। রাতে আমি কক্ষনো ব্রিজ পার হই না। ওটি আমার মানত করা ব্যাপার। ধরুন, হঠাৎ কেউ যদি ঝাঁপ দেয় জলে, তখন? দুটিমাত্র পথ খোলা থাকে—হয় আপনাকেও ওই বরফ-জলে ঝাঁপ দিতে হয় লোকটাকে বাঁচানোর জন্য; ভারি বিপজ্জনক কাণ্ড সেটা। তা নয় তো লোকটার আশা ত্যাগ করতে হয়, কিন্তু সেই ঝাঁপ দেওয়া থেকে নিরস্ত হলে অনেক ক্ষেত্রে তা দারুণ বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। গুড নাইট। কি? ওই জানালার ধারের মেয়েগুলো? স্বপ্ন ওরা,

* দেশোয়ালি ভাই।—অনুবাদক॥

মঁসিয়্য, সস্তার স্বপ্ন, ইণ্ডিস্ দ্বীপপুঞ্জে চট করে ঘুরে আসবার হাতছানি! ওদের সারা গায়ে মশলার সুগন্ধ। ভেতরে যাওয়া-মাত্র জানলার পর্দা ওরা ফেলে দেবে; যাত্রা হবে শুরু। নগ্ন তনুর ওপর ভর করবেন দেবতারা; দ্বীপগুলি দুলতে থাকবে। ভিখারীদের মাথায় পামগাছের পাতার গুছি দিয়ে তৈরী মুকুট দুলবে। গিয়ে দেখুন না একবার।

## দুই

অনুতপ্ত বিচারক ব্যাপারটা কি? ওই ছোট্ট কথাটায় আপনি বড় বিচলিত হয়ে পড়েছেন, দেখছি। বিশ্বাস করুন আপনাকে নাজেহাল করবার কোনো অসদুদ্দেশ্য আমার ছিল না, যদি চান কথাটা খুলে বলতে পারি। বলতে গেলে, ওটা সত্যিই আমার এক চাকরি-বিশেষ। কিন্তু আমার গল্পের শুরুতে আপনাকে গোটা কয়েক কথা বলে রাখতে চাই যার সাহায্যে আপনি গল্পটা সহজেই বুঝবেন।

বছর-কয় আগে প্যারিসে আমি উকিল ছিলাম, বেশ নামজাদা উকিল। এটুকু বলে রাখি, যে নামটা বলেছিলাম আপনাকে, সেটা আমার আসল নাম নয়। বড় বড় কেস্ নেওয়াটাই আমার বৈশিষ্ট্য ছিল। বলতেই বলে না, বিধবা আর অনাথ? কেন যে বলে, জানি না, বোধহয় বিধবারা ঠকাতে কম ওস্তাদ নয়, আর অনাথগুলো সচরাচর ধনুর্ধর হয় এক-একটি। তবু, প্রতিবাদীর গায়ে কোনক্রমে একবার যদি আমি দুর্গতের গন্ধ পেতাম, নেমে পড়তাম কাজে। সে কি যে-সে কাজ! ঝড় বইয়ে দিতাম! অকপটে দেখিয়ে দিতাম আমার সহানুভূতির বহর। যদি সে সময়ে দেখতেন আমায়,

ভাবতেন, রাতে আমার শয্যাসঙ্গিনী বোধহয় ন্যায়ের দেবী স্বয়ং। আমার যথাযথ কণ্ঠস্বর, আবেগের যাথার্থ্য, প্রত্যয় আর উদ্দীপনা, আদালতে ভাষণদানের সময় প্রচ্ছন্ন রোষ—যদি দেখতেন, মুগ্ধ হয়ে যেতেন আপনি। আমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন, ভাগ্যলক্ষ্মী আমার ওপর কত প্রসন্ন, আর অভিজাত আদব-কায়দা আমার আপনিই এসে পড়ে। তার ওপর, দুটি আন্তরিক অনুভূতি আমার মনে জোগাত উৎসাহ—সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত পক্ষেরই সমর্থক হবার আত্মপ্রসাদ, আর বিচারকদের প্রতি মোটামুটি একটা সহজাত ঘৃণার ভাব। অবশ্য, ঘৃণাটা খুব যে সহজাত ছিল, বলতে পারি না। এখন বুঝি, ওর পিছনে ছিল একটি কারণ। তবু, আপাতদৃষ্টিতে দেখে ওটাকে একটি রিপু বলেই মনে হত। এ কথাটা এখন অন্তত নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে বিচারক না হলে আমরা অচল। তাসত্ত্বেও আমি কোনোমতে বুঝে উঠতে পারতাম না কি করে অমন আশ্চর্যজনক কাজে মানুষ হাত দিতে পারে। নিজে চোখে দেখতাম, তাই হাত যে দিতে পারে—তা মেনে নিতাম, যেমন মেনে নিতাম পঙ্গপালের অস্তিত্ব। অবশ্য তার মধ্যে পার্থক্য এটুকু ছিল যে ওই অর্থোপ্টেরা জাতের কীটগুলো যখন ঝাঁক বেঁধে আসত, এক কানাকড়িও কোনদিন আমি তা থেকে উপার্জন করি নি, কিন্তু যে মানুষগুলোকে আমি ঘৃণা করতাম তাদের সাথেই বাতচিত না করলে আমার পকেট ভারি হওয়া দুরূহ ছিল।

যতই হোক, সর্বদা আমি ন্যায়ের পক্ষেই যুঝে এসেছি; তার চেয়ে বড় শান্তি বিবেকে মেলে না। 'আইনের অনুভূতি, ন্যায্যতার আত্মপ্রসাদ, আত্ম-অনুরাগের সুখ—এগুলি যে কত শক্তিশালী, এদের কল্যাণেই আমরা মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারি, এগিয়ে চলতে পারি সমুখ-পথে, তা আপনি জানেন সুহৃদ্বরেষু। আবার, মানুষকে এগুলো থেকে বঞ্চিত ক'রে দেখুন, রাতারাতি তারা খ্যাপা কুকুর হয়ে উঠবে। জগতে যত পাপ হয়েছে, তার অনেকগুলোই

সাধিত হয়েছে—অন্যায়ের পথে চলবার অভিশাপ লোকে বরদাস্ত করতে পারে নি বলে। এক ব্যবসায়ীকে জানতাম, যার স্ত্রী ছিল আদর্শ ঘরণী, সবারই শ্লাঘার পাত্রী, তবু ভদ্রলোক স্ত্রীকে ঠকালো। তারপর, অন্যায় করবার দরুন, নিজেকে ধর্মভীরু অভিহিত করবার সব পথ রুদ্ধ করে দেবার ফলে লোকটা বাস্তবিক খেপে উঠল। স্ত্রী যতই ধর্মপথে চলতে লাগল, লোকটা ততই তিরিক্ষে হয়ে উঠল। শেষ অবধি, অন্যায়ের জীবন যাপন করা ওর পক্ষে অসহ্য হয়ে পড়ল। কি করল ও, বলুন দেখি? স্ত্রীকে ঠকানো বন্ধ করল? মোটেই না। স্ত্রীকে খুন করল। তা নইলে তো ওর কথা আদৌ জানতেই পারতাম না।

আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা এর চেয়ে অনেক বেশি কাম্য, শ্লাঘনীয় ছিল। আমার অপরাধী হবার কোনো শঙ্কাই ছিল না ( বিশেষত বউ খুন করবার প্রশ্ন অবান্তর, কারণ আমি অকৃতদার ), তার ওপর আমি ছিলাম তাদের পক্ষ-সমর্থন করবার কাণ্ডারী, তারা যদি সহৃদয় খুনী হয় তবেই আমি তাদের সমর্থন করতাম, যেমন জংলীদের মধ্যে অনেকে থাকে না, সহৃদয় জংলী? যেভাবে আমি তাদের পক্ষ সমর্থন করতাম, নিজেই আমি তা দেখে মোহিত হতাম। পেশাদার জীবনে আমার বিরুদ্ধে কেউ কোনদিন বিন্দুমাত্র অভিযোগ আনতে পারে নি। কোনদিন ঘুঁষ নিই নি আমি, এ কথা না বললেও চলত, আর কোন পরোক্ষ পথেরও কখনো শরণ নিই নি। আর—আরো বড় কথা—কোনদিন কোন সংবাদপত্রসেবীকে হাত করবার বা কোন সিভিল সার্ভেণ্টকে বন্ধু বানাবার মত নীচবুদ্ধি আমার হয় নি। এমন কি, বার দুই-তিন আমায় লীজন্ অব্ অনার্-এ ভূষিত করবার প্রস্তাব যখন ওঠে, ভাগ্যক্রমে আমি তা প্রত্যাখ্যান করবারও সুযোগ পেয়েছিলাম—আমার একমাত্র পুরস্কার পেতাম সেই প্রত্যাখ্যান করেই। আর, কখনো আমি গরীবদের থেকে ফী নিতাম না এবং তা নিয়ে গর্ব করতাম না। দোহাই সুহৃদ্বরেষু, ভাববেন

না যেন—আমি বড়াই করছি! উচ্চাভিলাষ নামে যে বুভুক্ষার প্রচলন আমাদের সমাজে আছে, তা দেখে বরাবর আমার হাসি পেয়েছে। আমার লক্ষ্য ছিল উর্ধ্বমুখী ; লক্ষ্য করুন, এ ক্ষেত্রে কতটা যুক্তিযুক্ত আমার এই কথাটা!

আমার সন্তোষ যে কতটা, ইতিমধ্যেই তা আপনি নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছেন। নিজের প্রকৃতি আমি ষোল-আনাই উপভোগ করেছি, আর আমরা জানি যে এটাই হচ্ছে সব সুখের উৎস, পরস্পরকে প্রীত করবার খাতিরে অবশ্য অনেক সময়েই আমরা এই সুখকে স্বার্থপরতা বলে অভিহিত করি। অন্তত বিধবা আর অনাথের প্রতি মমত্বপূর্ণ যে-অংশটা, আমার প্রকৃতির সেই অংশটা আমার এত উপভোগ্য ছিল যে কালক্রমে সেটিই, নিয়মিত রসদ পেতে পেতে, আমার জীবনের সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। আমার ভারি ভাল লাগত, অন্ধদের রাস্তা পার করে দিতে। যত দূর থেকেই দেখি না কেন—কোন ফুটপাথের ধারে ইতস্তত করছে একটি যষ্টি, দৌড়ে যেতাম আমি, হয়তো আর-কেউ সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে, তার ঠিক এক-সেকেণ্ড আগে পৌঁছে যেতাম অকুস্থলে, অন্ধকে কেড়ে নিতাম অপরের গ্রাস থেকে, ধীরে দৃঢ়পদক্ষেপে তাকে পায়ে-চলার পথ বরাবর পার করে দিতাম, যানবাহনের ভিড় তুচ্ছ করে; অন্য ফুটপাথে পৌঁছে আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিতাম, দু জনেই সমান কৃতজ্ঞ! সেইভাবেই আমি নতুন পথচারীকে নিশানা দিয়ে দিতে, আলো দিতে, মাল-বোঝাই ঠেলাগাড়ী ঠেলে দিতে, হঠাৎ-থেমে-যাওয়া মোটরে হাত লাগাতে, মুক্তি-ফৌজের মেয়ের হাত থেকে কাগজ কিনতে, কিংবা বুড়ি ফেরিওয়ালার থেকে ফুল কিনতে (যদিও জানতাম সে ফুল মঁপারনাস্ কবরখানা থেকে চুরি করা) আমার ভারি ভাল লাগত। আর আমার ভাল লাগত—বলতেও আমার মাথা কাটা যাচ্ছে—আমার ভাল লাগত ভিক্ষে দিতে। অত্যন্ত গোঁড়া এক খ্রীশ্চান বন্ধুকে আমি বলতে শুনেছি যে তার দোরে ভিখারী

এলেই সর্বপ্রথম মনটা তার খিঁচিয়ে ওঠে। আমার তো আরো খারাপ দশা : মন আমার আনন্দে আটখানা হয়ে উঠত। থাক, ও বিষয়ে আর আলোচনা না-করাই ভাল।

বরং আমার সৌজন্যবোধ সম্বন্ধে দু কথা আলোচনা করা যাক। তার খ্যাতি ছিল সর্বত্র, কোনো প্রশ্নের উর্ধ্বে। সত্যি বলতে কি কোথাও কেতাদুরস্ত আদব দেখাবার সুযোগ পেলে আমার ভারি আনন্দ হত। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম যদি কোনদিন সকালে বাসে কিংবা আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেনে কাউকে আমার-জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারতাম কিংবা কোনো বুড়ির হাত থেকে পড়ে-যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে আমার সদাপ্রফুল্ল মুখের হাসি-সমেত সেটা তাঁকে ফেরত দিতে পারতাম, কিংবা আমার চেয়েও কর্মব্যস্ত কাউকে আমাব ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিতে পারতাম—সেটা আমার কাছে তবে স্মরণীয় দিন হয়ে থাকত। আমি বিশেষ উল্লসিত হয়ে উঠতাম যে দিন, সরকারি যানবাহনের হবতালের দরুন, বাস-স্টপ থেকে আমার হতভাগ্য সমনাগরিকদের কয়েকজনকে আমার গাড়ী-বোঝাই করে ঘরে ফিরিয়ে দিতে পারতাম। থিয়েটারে নিজের আসন ছেড়ে দেওয়া কোনো দম্পতির বসবার জায়গা করে দিয়ে, কোনো মেয়ের সুটকেশ ট্রেনের র‍্যাকে তুলে দেওয়া—এসব আমি নিয়মিতভাবেই করতাম কারণ ওগুলো করতে পারবার পথ চেয়ে আমি সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকতাম আর বুক আমার ভরে যেত ওসব করতে পারবার আনন্দে।

ফলে, উদারচেতা বলে আমার নামও হয়ে গেল ; আমি অবশ্যই উদারচেতা ছিলাম বই-কি। প্রকাশ্যে, গোপনে দান আমি কম করতাম না। কোনকিছু বা কয়েকটা টাকা দান করতে গিয়ে ব্যথা পাওয়া দূরের কথা, অত্যন্ত আনন্দ পেতাম আমি—এক-একসময় বরং দুঃখ পেতাম, এইসব সামগ্রী কতটুকুই-বা উপকার করতে পারে অন্যদের, ভেবে। দিতে পারলে আমি এত খুশি হতাম যে কারো

কাছে বাধিত হওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে ঘৃণ্য ছিল। টাকাকড়ির ব্যাপারে হিসেব রাখা আমার কাছে ভয়ানক বিরক্তিকর লাগত, যদি কখনো করতে হত, খুঁতখুঁতে মন নিয়ে করতাম। আমার স্বেচ্ছাচারের আমিই ছিলাম একচ্ছত্র প্রভু।

এই সামান্য কয়েকটি কথাতেই আপনি বুঝতে পারছেন, আমার জীবন আর বিশেষত আমার পেশা আমার কাছে কত রমণীয় ছিল। আদালতের করিডোরে কোনো প্রতিবাদীর স্ত্রী এসে পথ আগলে যদি দাঁড়ায়, যার স্বামীর হয়ে আমি ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে কিংবা করুণাপরবশ —অর্থাৎ বিনা ফী-তে—লড়েছি, সে যদি বলে কোনোকিছু দিয়ে কখনোই আমার এ ঋণ শোধ করা যাবে না, তার উত্তরে আমি যদি বলতে পারি, এ এমন-কিছু অস্বাভাবিক কাজ আমি করি নি, যে-কেউই করতে পারত এ কাজ, কিংবা তাকে সামান্য কিছু টাকা সাহায্য যদি দিতে পারি এই দুর্দিনে,—আর মহিলার আবেগে ছেদ টানবার জন্য, তার স্বাভাবিকতা বজায় রাখবার জন্য—তার মত গরীবের হাতে চুমু দিয়ে নিজের পথে যদি পা বাড়াতে পারি—বিশ্বাস করুন, সুহৃদ্বরেষু, তা কোনো উচ্চাভিলাষের খাতিরে নয়, তা সদগুণের খাতিরেই সৎকর্ম করতে পারবার শিখরে উন্নয়ন!

এই শিখরেই আপাতত থামা যাক। এখন বোধহয় আপনি টের পাচ্ছেন আমি ঊর্ধ্বমুখী লক্ষ্য বলতে কি বুঝি। আমি এই সর্বোচ্চ শিখরগুলির কথাই বলছিলাম, যেখানে আমি সত্যি করে বেঁচে থাকার স্বাদ পাই। সত্যিই আমি অভিজাত সমাজে ছাড়া অন্য কোথাও স্বস্তি পাই না। এমনকি দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিতেও আমি আর-সবার ওপরে থাকতে চাই। আণ্ডারগ্রাউণ্ডের চেয়ে বাস আমি পছন্দ করতাম বেশী, ট্যাক্সির চেয়ে খোলাগাড়ি, বাড়ির ভেতরের চেয়ে ছাদের ওপর। আমি একজন অপেশাদার পাইলট হিসাবে বরাবর মাথা খোলা প্লেন ব্যবহার করে এসেছি। যখনি সমুদ্রযাত্রা করেছি, সবচেয়ে উঁচু ডেক্-এর যাত্রী হয়েছি।

পার্বত্য অঞ্চলে হরদম আমি উপত্যকাগুলো এড়িয়ে গিয়েছি গিরিসঙ্কট অধিত্যকার পথিক হয়ে ; আর যাই হোক, আমি ছিলাম উচ্চ ভূমির অধিবাসী। ভাগ্যক্রমে কোনদিন আমায় যদি লেদ-যন্ত্রের মিস্ত্রী আর ছাদ-পিটুনির মিস্ত্রী—এ-দুটো কাজের একটা বেছে নিতে হত, নিঃসন্দেহে আমি ছাদের কাজই বেছে নিতাম, অত উঁচুতে কাজ করতে করতে মাথাঘোরা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেত। কয়লা-গুদাম, জাহাজের খোল, গলি-ঘুঁজি, গুহা, গর্ত—এসব আমার ভীতিজনক লাগত। এমনকি গুহা-বিশারদদের প্রতিও আমি বিশেষ এক অবজ্ঞা পোষণ করতে শুরু করেছিলাম, যাদের বাহাদুরি খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই ফলাও করে লেখা থাকত দেখে আমার গা বমি-বমি করত। দুই হাজার ফুট মাটির নীচে নেমে যারা যায়—কোন্ মুহূর্তে পাথরের খাঁজে মুণ্ডু আটকে যাবে তার ঠিক নেই (বোকাগুলো পাথরের খাঁজকে আবার নাম দিয়েছে 'সাইফন'!)—তাদের প্রকৃতি যে কতদূর বিকৃত আর নোংরা, তা বোঝা যায়। ওদের মনের অতলে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ লুকিয়ে থাকে।

আবার সমুদ্রের পনেরো শ ফিট ওপরেই কোন প্রাকৃতিক ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমি যে কত স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারতাম, কি বলব, বিশেষত একা যদি থাকতাম, মানুষ নামে পিঁপড়েগুলোর বহু ঊর্ধ্বে! অনায়াসে আমি বুঝতে পারতাম ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা, শিক্ষাপ্রচার, আগুনের ভেলকি, এসব বেশ উঁচু থেকে কেন করা হয়। আমার মতে, কোনো জেল-ঘরে কিংবা মাটির নীচের কুঠরিতে কখনও ধ্যানধারণা করা সম্ভব নয় (এক যদি কুঠরিটা কোনো দুর্গের চূড়ায় থাকত, আর সামনে থাকত উন্মুক্ত নৈসর্গিক দৃশ্য) ; সেখানে মানুষ শুধু পচতেই পারে। আরো বুঝি, কয়েদখানায় গিয়ে অনবরত নাকের সামনে দেয়াল দেখতে অপারগ হয়ে অতিবড় সাধুরাও কেন ভেক পালটায়। অবশ্য আমার সম্বন্ধে আমি বলতে পারি, আমি

পচে মরি নি। সারাদিনের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমি বহুবার ঊর্ধ্বমুখী করে নিই নিজেকে, অন্তরে জ্বেলে দিই দৃশ্যমান বহ্নি, এক সানন্দ অভিনন্দন যেন আমায় লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে, দেখি। এভাবেই আমি জীবনে ভারি তৃপ্ত ছিলাম, আর তৃপ্ত ছিলাম নিজের উৎকর্ষ সম্বন্ধে।

আমার পেশার কল্যাণে আমার এই ঊর্ধ্বানুগ স্বভাব তার খোরাকও পেত প্রচুর। প্রতিবেশীর প্রতি কখনো কোন তিক্ততা আমার মনে ঠাঁই পেত না; আমার প্রতিবেশীদের কাছে কোনদিন হাত পাতবার বদলে তাঁদেরই আমি আমার কাছে ঋণী রাখতাম। এইভাবেই আমি বিচারকের চেয়ে উঁচু মনে করতাম নিজেকে, বিচারককে নিজে নিজেই বিচার ক'রে; প্রতিবাদীর চেয়ে উঁচু মনে করতাম নিজেকে, কারণ তাকে জোর করে আমি আবদ্ধ করতাম কৃতজ্ঞতার পাশে। এটা ভুলবেন না, সুহৃদ্বরেষু, আমার জীবন ছিল নিরপরাধ। কোথাও কোন বিচারের তোয়াক্কা আমি রাখতাম না; আদালতের মেঝেয় আমার থাকা সম্ভব হত না, আমি থাকতাম উঁচু অলিন্দে, যেখান থেকে আমায় আবাহন করে ডেকে আনা হত যেমনভাবে দেবতাদের মাঝে মাঝে ডাকা হয় কোন কাজে অর্থ-সংযোগ করবার উদ্দেশ্যে। হাজার হলেও, বিরাট বহরের জীবন যাপন করাই হল জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার, অভিনন্দন কুড়োনোর একমাত্র পন্থা।

এমনকি, আমার খদ্দের, অনেক ভাল ভাল আসামীই, এইভাবে খুন করতে প্ররোচিত হয়েছিল। তখন তাদের যে শোচনীয় অবস্থা হত, তার বিবরণ খবরের কাগজে পড়ে তারা মনে মনে পেত এক নিরানন্দের সান্ত্বনা। আর-দশজনের মত অজ্ঞাত, অখ্যাত হয়ে থাকা তাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠত, সেই ধৈর্যচ্যুতিই তাদের বাধ্য করত নিদারুণ চরম পন্থা বেছে নিতে। একবার যদি কেউ কুখ্যাত হয়ে যায়, তার পক্ষে নিজের দ্বাররক্ষীকে খুন করা তো সামান্য কাজ।

দুঃখের বিষয়, এই খ্যাতি বড় স্বল্পস্থায়ী, কারণ এমনো অনেক দ্বাররক্ষী আছে যাদের গলায় ছুরি পড়া দরকার এবং পড়েও। কাগজের হেডলাইনগুলো সর্বদাই আদালতের বিচিত্র কাহিনী পরিবেষণ করাটা একচেটে রাখে, কিন্তু সেখানে আসামীর নাম কতক্ষণ আর থাকে? প্রতিনিয়ত নামগুলো যায় পালটে। আদতে, মোদ্দা কথা হল, অতটুকু অক্ষরে কাগজে নাম তোলবার জন্য কত কাঠখড়ই না খুনীদের পোড়াতে হয়। এমনি কোন খ্যাতনামা উমেদারের পক্ষ সমর্থন করতে যাওয়ার মূল্য আমাদের নির্ঘাৎ স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়া: একই স্থানে, একই কালে, কিন্তু অর্থকরী ব্যাপারটা আরো ঘোরালো করে। ফলত আমার লক্ষ্য হল, ওদের পক্ষ সমর্থন করা যতটা সম্ভব কম হারে; আরো বেশি কৃতিত্বের সেটা। যেটুকু তাদের খরচ করতে হত, সেটা আমার পদ-মর্যাদার খাতিরে। প্রতিদানে, মুছে যেত তাদের প্রতি আরোপ করা আমার অবজ্ঞা, প্রতিভা আর আবেগ, অর্থাৎ কোনরকম বাধ্যবাধকতা আর থাকত না। বিচারকেরা যদি শাস্তি দিতেন, প্রতিবাদীরা প্রায়শ্চিত্ত করতেন, আর আমি, কোন দায়িত্বের ভার না-থাকার দরুন, দোষী সাব্যস্ত হল কি অর্থদণ্ড দিয়ে খালাস পেল তার পরোয়া করতাম না, চালিয়ে যেতাম নিজের কাজ যেন স্বর্গের আলোয় অবগাহন করে।

একে স্বর্গ ছাড়া আর কি বলতে পারেন, সুহৃদ্বরেষু?—আমার আর জীবনের মাঝে যখন নেই দ্বিতীয় কোন প্রভাব? এমনি ছিল আমার জীবন। কিভাবে জীবনধারণ করব, তা আমায় কোনদিন শিখতে হয় নি। তা যদি বলেন, জন্মেই আমি সবকিছু জানতাম। অনেকের সমস্যা হয়, কি করে আর-দশজনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবে অথবা তাদের সঙ্গে সন্ধি করবে। আমার ক্ষেত্রে, সবার সাথেই যেন আগে থেকে বোঝাপড়া করা ছিল। যখন মানানসই লাগত, আমি হতাম অন্তরঙ্গ; প্রয়োজন এলে, নীরব; খোলামেলা

স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করতে পারতাম যেমন, তেমনি পারতাম নিজের দূরত্ব বজায় রাখতে ; সর্বদা সামঞ্জস্য বজায় রেখে আমি চলতে পারতাম। কাজেই আমি ছিলাম অত্যন্ত জনপ্রিয় আর সমাজে আমার যশঃকীর্তিও অসংখ্য। দেখতে শুনতে আমি স্বচ্ছই ছিলাম ; আমার মত অক্লান্তভাবে নাচতে কম লোকেই পারত, আর পাণ্ডিত্যও আমি কম নই, সুযোগ পেলেই তার পরিচয় দিয়ে দিতাম। একাদিক্রমে আমি—চাট্টিখানি কথা নয়—নারী আর ন্যায়, দুটোই সমানভাবে ভালবাসতে পারতাম। খেলাধুলোয় যেমন শিল্পকলাতেও তেমনি দক্ষতার সাথে আমি অংশ নিতাম ; কিন্তু আর থাক, এখানেই থামি, নয় তো আপনি ভাববেন আমি আত্মস্তুতি করছি। কিন্তু ভাবতে পারেন, কি জীবনটাই না আমার ছিল ? ক্ষমতার চরম শীর্ষে আসীন, দিব্য স্বাস্থ্য, সর্বগুণে গুণান্বিত, দেহের আর মনের ব্যায়ামে বিশেষ পারদর্শী, ধনীও না দরিদ্রও না, রাতে খাসা ঘুম হয়, নিজেকে নিয়েই প্রধানত সুখী, অবশ্য সহৃদয় সখ্য ছাড়া অন্য-কোনরকমে তা প্রকাশ যে করে না। এই তো সফল জীবন, নয় কি ? আমার ঔদ্ধত্য মাফ করবেন।

সত্যিই, কম লোকেই আমার চেয়ে স্বাভাবিক হতে পারে। আমি চলতাম জীবনের সাথে পূর্ণরূপে তাল বজায় রেখে, আপাদ-মস্তক তার ছন্দেই ছন্দিত হয়ে, তার পরিহাস, তার মাহাত্ম্য, তার গোলামি—কোনটাই বাদ না দিয়ে। এইযে শরীর যা মানুষকে প্রেমে কিংবা নির্জনতায় ক্ষুণ্ণ বা নিরুৎসাহিত করে, আমায় কিন্তু সে কোনদিন বশ্যতা স্বীকার তো করায়ই নি, উপরন্তু দিয়ে এসেছে নিরবচ্ছিন্ন সুখ। শরীর উপভোগ করবার জন্যই না পেয়েছি ! তা থেকেই তো পেয়েছি আমার সঙ্গতি, আমার সান্নিধ্যে এসে লোকে অনুভব করত এক ঢালাও প্রভুত্ব, অনেকে আমার কাছে এসে পেত জীবনে চলবার পাথেয়। কাজেই আমার সঙ্গ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। প্রায়ই লোককে বলতে শুনতাম তারা আমায় ইতিপূর্বে

কোথায় যেন দেখেছে। জীবন, তার অধিবাসীরা আর তার উপঢৌকন—এসবই আমার কাছে অযাচিতভাবে এসে ধরা দিয়েছে আর আমি সেসব অর্ঘ গ্রহণ করেছি সহৃদয় গর্বে। সত্যি বলতে কি, এমন পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ হবার দরুন, নিজেকে আমি মনে করতাম অতিমানব বলে।

সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম ( আমার বাবা ছিলেন একজন অফিসার ), তাসত্ত্বেও, এক-একদিন সকালে, দোহাই আপনার, কিছু মনে করবেন না, আমার নিজেকে মনে হত রাজার কুমার বলে, কিংবা মনে হত আমি যেন জ্বলন্ত একটা ঝোপ। আর-সবার চেয়ে আমি বুদ্ধিমান ছিলাম বলে মনে যে নিশ্চয়তা ছিল, এটা তার দরুন নয়, আপনাকে বলে রাখি কিন্তু। তা ছাড়া এ নিশ্চয়তা এমন কিছু ফলপ্রসূ নয় কারণ জগতে অনেক মূর্খেও এ নিশ্চয়তার অধিকারী হয়। না, বলতেও আমার বাধছে, তবু শুনুন—চারদিক থেকে এমনভাবে প্রাচুর্য এসে পড়েছিল আমার জীবনে যে নিজেকে আমি বিশেষ কেউ মনে করতাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি একান্তই বিশেষ কেউ ছিলাম সফলতার দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন পথে। সে সফলতার হেতু যে আমার নিজস্ব গুণগুলি, তা ঠিক মেনে নিতে আমি চাই না এবং এত বিভিন্ন প্রকার গুণের পরাকাষ্ঠা একজনের মাঝে যে সন্নিহিত হয়েছে—তা নেহাত দৈবক্রমে নয়। কাজেই আমার সুখের জীবন যাপন করতে করতে আমার ধারণা হয়েছিল কোনো ঊর্ধ্বতন শক্তির অনুমোদনক্রমেই আমার ওপর বর্ষিত হয়েছে এত সুখ। আপনাকে বলছি যে ধর্ম বলে কিছুই আমি মানতাম না,—এতেই আপনি বুঝছেন, কতবড় আত্মপ্রত্যয় আমার ছিল। অত্যন্ত মামুলি তা হয়তো লাগছে আপনার কাছে, তবু মাঝে মাঝে এর সাহায্যেই আমি উঠে যেতে পারতাম দৈনন্দিন কর্মধারার অনেক ওপরে, এবং সত্যিই আমি বহু বছর ধরে যাকে বলে উড়ে চলা—উড়ে চলেছিলাম, আর এখনো আমার অন্তরের অন্তস্তলে কেউ যেন

কেঁদে মরে সেসব দিন ফিরে পাবার আশায়। এই ওড়া আমার বন্ধ হয় নি, যতদিন না, সে দিন সন্ধ্যায়···নাঃ, থাক, সে আরেক কথা! তা আমার ভুলেই যাওয়া উচিত। হাজার হলেও আমি হয়তো অতিরঞ্জিত করছি সত্যকে। সর্বত্রই আমি পরম নিশ্চিন্তে যেমন ঘুরে বেড়াতাম, তেমনি কোনো কিছুতেই আমি পেতাম না পরিতৃপ্তি। প্রতিটি আনন্দ উপভোগ করতাম নতুন কোন আনন্দের কামনা হৃদয়ে জ্বেলে। উৎসবের পর উৎসবে গাঁথা ছিল আমার জীবন। কখন কখন রাতের পর রাত আমি নেচেছি জীবন আর মানুষ সম্বন্ধে উন্মাদ থেকে উন্মাদতর মনোভাব নিয়ে। এক-এক সময় অক্লান্ত নাচ, সামান্য সুরা, বন্য আদিম উৎসাহ, অন্যদের দুর্নিবার উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে, এমনি অনেক রাতের শেষে দারুণ অবসন্ন এক বিহ্বল রভসে আমার সত্তা মুহ্যমান হয়ে পড়ত, আমার মনে হত—অবসাদের চরম শীর্ষে, এক লহমার জন্য—আমি যেন এত দিনে বুঝতে পেরেছি এই দুনিয়ার আর তার অধিবাসীদের অস্তিত্বের রহস্য। কিন্তু পরদিনই ক্লান্তি যেত উবে, উবে যেত সেই রহস্যের সচেতন জ্ঞান। আবার আমি নতুন করে ছুট দিতাম। সর্বদাই খাতির পেয়ে পেয়ে আমি ছুটে চলতাম এইভাবে, অতৃপ্ত বুভুক্ষায়, কোথায় থামব গিয়ে জানতাম না, যতদিন না—যতদিন না সেই সন্ধ্যা এল, আর কি যতদিন না থেমে গেল সব সঙ্গীত, নিভে গেল সমস্ত আলো। যে কলরবমুখর পার্টিতে আমি মহাসুখে ডুবে ছিলাম···দাঁড়ান, আমাদের সাকরেদ ওই বনমানুষটাকে একটু ডাকি। মাথা নেড়ে ওকে ধন্যবাদ জানান আর, মোদ্দা কথা হল, এই নিন, একত্রে পান করা যাক, কারণ আপনার সাথে আমার মতের মিল থাকা একান্তই কাম্য।

ওহো, এই উক্তিতে আপনি দেখছি বিস্মিত হচ্ছেন। কেন, জীবনে কোনদিন হঠাৎ আপনি চান নি কারো সাথে আপনার মতের মিল, কারো সাহায্য, কারো সাহচর্য? আলবৎ, চেয়েছেন

বইকি। অনেক ঠেকে শিখেছি মতের মিলটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে। এটুকু মেলে সহজেই, আর তা ছাড়া, বিশেষ কোন বাধ্যবাধকতাও থাকে না তেমন। 'দোহাই আপনার, বিশ্বাস করুন আমার সহৃদয় সহানুভূতিতে'—মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া ওঠে—'বেশ, এইবার অন্য-কিছু নিয়ে আলোচনা করা যাক'। এযেন কোন বোর্ড-চেয়ারম্যানের অনুভূতি ; নানা বিপত্তির শেষে অতি সহজেই এ চীজ মেলে। বন্ধুত্ব অবশ্য এর চেয়ে কম সরল। দীর্ঘ দিনের কঠিন অধ্যবসায়ে তা মেলে, আর-একবার যদি মিলে যায়, তা থেকে রেহাই পাওয়া মুস্কিল। একেবারে কলুর বলদের মত ঘুরে চলতে হয়। তাই বলে ভাববেন না যে আপনার বন্ধুরা প্রতি সন্ধ্যায় আপনাকে টেলিফোন করে জেনে নেবে—অবশ্য তা করাটাই উচিত হত তাদের দিক দিয়ে—যে আপনি দৈবাৎ আজ সন্ধ্যায় আত্মহত্যা করছেন কি না, কিংবা আপনার সঙ্গীর প্রয়োজন আছে কি-না, কিংবা বেড়াতে যাবার মত মেজাজ আছে কিনা। দেখে নেবেন, নির্ঘাৎ যে রাতে আপনি নিঃসঙ্গ নন, যে রাতে জীবন আপনার কাছে রমণীয়, সেই রাতেই তারা টেলিফোনে ডাকবে আপনাকে। আত্মহত্যার ব্যাপারে বরং তারা আপনাকে সে দিকে আরো ঠেলেই দেবে, তাদের মতে—আপনি তাদের কাছে যে সবের জন্য ঋণী, সেসব কারণে। সুহৃদ্বরেষু, ভগবান আমাদের রক্ষা করুন, যেন বন্ধুরা আমাদের স্তব করতে না বসে যায়! যাদের কর্তব্য হল আমাদের ভালবাসা—অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন, কুটুম (আহা! বলিহারি এই শব্দ!)—তাদের কথা আলাদা। তারা ঠিক যেটুকু বলবার বলতে জানে, নিমেষে লক্ষ্য ভেদ করতে পারে; তারা ফোন করে বসে, যেন রাইফেল তাগ্ করে মারছে। ধন্য তাদের নিশানা। ধন্য তারা!

কি? কোন্ সন্ধ্যার কথা বলছি? সবুর মশাই, বলব সবই। একদিক দিয়ে ধরতে গেলে ওইসব বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে যে বলছি, তা আমার কথার খেই ধরেই বলছি। জানেন, একজনের

কথা আমি শুনেছি, যার বন্ধুকে পুলিশে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার পর থেকে সে রোজ রাতে ঘরের মেঝেয় শুয়ে থাকে কারণ তার বন্ধু যে আনন্দ থেকে বঞ্চিত, সে সুখ সে নিজে কেমন করে উপভোগ করবে? কিন্তু, সুহৃদ্বরেষু, আমাদের দুঃখে কে আর মেঝেয় শুতে যাচ্ছে, বলুন তো? আমি নিজে কি কখনো তা পারতাম? কিন্তু, পারলে, আমি বর্তে যেতাম, এবং পারবও। হ্যাঁ, আমরা সবাই তা পারব বই-কি—এমন দিন আসবেই আসবে, সে দিন হবে আমাদের মোক্ষের দিন। কিন্তু তা বড় সোজা কথা নয়, কারণ বন্ধুত্ব মানেই উদাসীনতা, নয়তো নিদেন-পক্ষে দুর্লভ। তার যা কাম্য, সে তা চরিতার্থ করতে অসমর্থ। হয়তো, বলা চলে, তার কাম্য সে সর্বান্তঃকরণে কামনা করে না! হয়তো জীবনকে আমরা তেমনভাবে ভালবাসি না! লক্ষ্য করে দেখছেন, একমাত্র মৃত্যুই পারে আমাদের সমস্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে? যে বন্ধুরা সত্ত সত্ত হারিয়ে গেল, তাদের কী ভালটাই না আমরা বেসে থাকি! কত সমীহই না করি আমরা আমাদের সেইসব গুরুদের, যাঁদের বাণী চিরতরে মৌন আজ, যাঁদের মুখ চাপা পড়ে গিয়েছে মাটির তলায়? অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উৎসৃত হয় তাঁদের প্রতি আমাদের সম্মান, যে সম্মান তাঁরা সারাটা জীবন ধরে প্রত্যাশা করে গিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে। কিন্তু কেন আমরা মৃতের প্রতি এত ন্যায়পরায়ণ, এত উদার হয়ে উঠি, জানেন কি? ভারি সোজা এর জবাব। কারণ, তাদের কাছে আমাদের আর-কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। আমাদের তাঁরা দিয়ে যান পূর্ণ স্বাধীনতা, দিয়ে যান অবাধ সময়, যাতে করে আমাদের কর্তব্যটুকু আমরা করি কোন-একটা ককটেল-পার্টি আর ছোট্ট সুন্দরী এক উপপত্নী নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসতে, অর্থাৎ হাতে যখন আর কিছু করবার থাকে না। তাঁরা যদি জোর করে কিছু চাইতেন, তা হত তাঁদের মনে রাখবার অনুরোধ, আর স্মরণশক্তি আমাদের অত্যন্ত দুর্বল। না, সম্প্রতি যাঁরা মরেছেন বন্ধুদের মাঝে তাঁদেরই আমরা

ভালবাসি সর্বাধিক, একমাত্র তাঁরাই মরেছেন দারুণ কষ্ট পেয়ে, তাঁরাই আমাদের সমস্ত আবেগের যোগ্য পাত্র, আমাদের অংশ-বিশেষ!

এই ধরুন না, আমার এক বন্ধু ছিল যাকে আমি সচরাচর এড়িয়ে চলতাম। তার সান্নিধ্যে আমি হাঁপিয়ে উঠতাম, আর, তাছাড়া, সে ছিল নীতিবাগীশ গোছের মানুষ। কিন্তু সে যখন মরতে বসল, আমি তার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম বইকি। হেন দিন ছিল না, যে দিন তাকে আমি দেখতে না যেতাম। আমার ওপর ভারি তুষ্ট হয়ে আমার দুই হাতে হাত রেখে সে মারা গেল। একটি মহিলা আমার পিছু নিয়েছিল, হঠাৎ তার কি সুমতি হল, যৌবনেই সে মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা আমার খালি হয়ে গেল! তার ওপর, বলব কি, মরল আত্মহত্যা করে! দোহাই হরি, কী আনন্দের শিহরণ অনুভব করলাম! ঘরের টেলিফোনটা বেজে ওঠে, হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হয়, অভীষ্টপূর্বক হ্রস্ব বাক্য গভীর অর্থপূর্ণ, চাপা যন্ত্রণা, আর খানিকটা আত্মগ্লানি, ব্যাস!

এই তো মানুষ, বুঝলেন সুহৃদ্বরেষু। মানুষের আছে দুটি মুখ: নিজেকে না ভালবাসলে সে অন্যকে ভালবাসতে পারে না। আপনার বাড়িতে কারো মৃত্যু হলে লক্ষ্য করে দেখুন আপনার প্রতিবেশীদের। যে যার দৈনন্দিন কাজের মাঝে নাক ডাকাতে বেশ ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ, ধরুন বাড়ির দ্বাররক্ষী মারা গেল। নিমেষে সব জেগে ওঠে, চঞ্চল হয়ে পড়ে, জানতে চায় কী হয়েছিল, সহানুভূতি জানায়। কেউ মরল কি অমনি শুরু হল আদিখ্যেতা। তারা ট্র্যাজেডিই চায় সারাক্ষণ; এটুকুতে বেশ মুখটা বদলায়, এ হচ্ছে ওদের টাকনা-বিশেষ। এইযে, দ্বাররক্ষীর মরবার কথা বললাম, তা কি কথায় কথায় এমনিই বললাম? আমার একটা দ্বাররক্ষী ছিল, অত্যন্ত কুৎসিত, পাজির পা-ঝাড়া, নীচতা আর বিদ্বেষে ভরা রাক্ষস যেন, সেণ্ট ফ্রান্সিসের করুণাধন্য সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কেউ যদি ওকে দেখতেন শিউরে

উঠতেন। বেটার সঙ্গে আমি কথা অবধি বলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু ওর উপস্থিতি পর্যন্ত আমার প্রথামাফিক সন্তুষ্টির প্রতিবন্ধক হয়ে উঠল। ও যখন মরল, আমি গেলাম ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। কেন, বলতে পারেন?

যাই হোক, শ্রাদ্ধের দু দিন আগে অবধি আমার বেশ ভাল লাগছিল। দ্বাররক্ষীর বউ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, ওদের একটা-মাত্র ঘরে সে শুয়েছিল, আর ওর কাছেই ঠেকোর ওপর তোলা ছিল কফিনটা। বাড়িসুদ্ধ সবাইকে নেমে আসতে হত ডাকের চিঠিপত্র নেবার জন্য; দরজা খুলে 'বঁজুর' মাদাম' বলে খানিক শুনতে হত ওর বউয়ের মুখে পরলোকগত প্রিয়তমের সুখ্যাতি তার শবের দিকে তাকিয়ে, তারপর চিঠি নিতে হত। এমন কিছু মজার ব্যাপারটা নয়। কিন্তু তবু, বাড়ির সকলকেই কার্বলিকের গন্ধে ভারাক্রান্ত ওই ছোট ঘরটার মধ্যে দিয়ে দিনান্তে একবার অন্তত যাতায়াত করতে হত। বাড়ির কোন ভাড়াটেই চাকর পাঠিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করত না, নিজেই আসত; এই অপ্রত্যাশিত আকর্ষণের বশে। চাকররাও আসত বইকি, তবে লুকিয়ে-চুরিয়ে। অন্ত্যেষ্টির দিন দেখা গেল দরজার তুলনায় কফিনটা বড়। 'হায় গো, ওগো,' বিছানা থেকেই ওর বউ যুগপৎ আশ্চর্যান্বিত, উল্লসিত, ক্ষুণ্ণ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কত বড়টাই না তুই ছিলি!' 'কোন ভয় নেই মাদাম,' ভারপ্রাপ্ত হিতৈষীরা অভয় দিল, 'সোজা দাঁড় করিয়ে ওকে বার করে নেব আমরা।' সত্যিই, সোজা দাঁড় করিয়ে ওকে ঘরের বার করে আবার বাইরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। একমাত্র আমিই ওর মধ্যে থেকে (আর-একজন ছিল, একটা সরাইয়ের দারোয়ান, যে শুনলাম রোজ মৃতের সঙ্গে একবোতলে মাল টানত) গিয়েছিলাম গোরস্থান অবধি ফুল ছড়িয়ে দিয়েছিলাম কফিনের ওপর আর কফিনের আড়ম্বর দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর গেলাম দ্বাররক্ষীর বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে, যে আমার নিপুণ ট্র্যাজেডি-অভিনেত্রীর ঢঙে

জানালো ধন্যবাদ। বলুন দেখি, এতসবের কি প্রয়োজন ছিল? কিছুই না, ওই ঢাকনা ছাড়া।

এভাবেই গোর দিতে গিয়েছিলাম একবার বার্ এসোসিয়েশনের এক প্রবীণ সহকর্মীকে। তিনি একজন কেরানী ছিলেন যার কোন তোয়াক্কা কেউ কস্মিনকালে করত না, একমাত্র আমি যার সাথে করমর্দন করতাম প্রায়ই। যেখানে আমি কাজ করতাম, প্রায় সবারই সাথে আমি করমর্দন করে নিতাম, এক একজনের সাথে বার-দুয়েক করে অবধি। তাতে আমার ক্ষতি তো কিছুই হত না, -আর সহৃদয় ওই সারল্যটুকুই ছিল আমার সন্তুষ্টির মূল উৎস, আমার জনপ্রিয়তার খোরাক। একজন কেরানীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বার্-এর প্রেসিডেন্ট-মশাই যেতে অপারগ। কিন্তু আমি গেলাম, তাও বিদেশ-যাত্রার প্রাক্কালে, অপ্রত্যাশিতরূপে, আর সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জানতাম, সবাই এটা লক্ষ্য করে নানারকম প্রশংসাসূচক মন্তব্য করবে আমার সম্বন্ধে। সুতরাং, দেখছেন, সে দিন যে অমন বরফ পড়ছিল, তাও আমায় আটকাতে পারে নি।.

কি? ও হ্যাঁ বলছি, ভয় নেই; তাছাড়া, আমাব কথার খেই মোটেই হারিয়ে যায় নি। কিন্তু তার আগে বলে রাখি যে আমার দ্বাররক্ষীর বউ, যে স্বামীর মৃত্যুর পর দামী ক্রুশ কিনতে, কফিনের ভারি ওক আর রুপোর হ্যাণ্ডেল কিনতে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল, মাসখানেকের মধ্যেই সে সুকণ্ঠ এক বাবুকে বরণ করে নিল। লোকটা বউটাকে পেটাতে শুরু করল; মর্মান্তিক কান্না শোনা যেত, আর পরমুহূর্তেই লোকটা তার জানালা খুলে তারস্বরে গাইতে শুরু করত ওর প্রিয় গান: 'নারী লো, তোর রূপে মরি মরি!' 'সবকটাই একরকম!' প্রতিবেশীরা টিপ্পুনি কাটত। একরকম কি? বলুন দেখি। বেশ তো, দেখুন, আপাতদৃষ্টিতে কেউই গায়কটিকে বরদাস্ত করতে পারত না, দ্বাররক্ষীর বউকেও পারত না। কিন্তু তারা যে পরস্পরকে ভালবাসত না, তার কোনো প্রমাণ আছে?

এমন কোনো প্রমাণ আছে যে সে তার স্বামীকে ভালবাসত না? সবচেয়ে মজার কথা—বেটা যখন হায়রান হয়ে ভাগল বউটাকে ফেলে—বউটা—সাধ্বী সতী—আবার শুরু করল তার মৃত স্বামীর প্রশংসা। জানি, অনেককে বাইরে থেকে দেখলে সাধু মনে হয়, কিন্তু অন্তরে তারা কত অকপট, বিশ্বাসী তা নাই-বা বললাম। একটা লোককে জানতাম যে তার জীবনের বিশটা বছর এক পাগলীর সেবায় নিয়োজিত করেছিল, তার জন্য নিজের সবকিছু ত্যাগ করেছিল, তার বন্ধুবান্ধব কাজকর্ম, জীবনের প্রতিপত্তি, কিন্তু একদিন সে সন্ধ্যাবেলায় উপলব্ধি করল যে মেয়েটিকে সে কোনোদিনই ভালবাসে নি। আদতে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল, আর-দশজনের মতই বীতস্পৃহ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই জীবনটাকে সাদামাটা না-রেখে সে সৃষ্টি করেছিল নানা জটিলতার আর নাটুকেপনার। কিছু-না-কিছু ঘটানোই ছিল ওর উদ্দেশ্য—আর এ থেকেই বোঝা যায় অধিকাংশ মানুষের কর্মধারা। একটা কিছু করতেই হবে, চাই প্রেমহীন দাসত্বও সই, নয় তো চাই যুদ্ধ কিংবা মৃত্যু। স্বাগত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া!

কিন্তু আমার অন্তত কোন অছিলা ছিল না। আমি হাঁপানো দূরের কথা, মহা স্ফূর্তিতে আমি ভেসে চলেছিলাম জীবন-জলধির ঢেউ থেকে ঢেউয়ের মাথায়। যে সন্ধ্যার কথা বলছি, সে সন্ধ্যায় বিশেষ করে মনটা আমার খুশি ছিল। তবু···জানেন, সুহৃদ্বরেষু, সেটা ছিল সুন্দর এক শারদ সন্ধ্যা, শহরের বুকটা তখনো বেশ উষ্ণ আর সেইন্ নদীর আশে-পাশে আর্দ্র। রাত হয়ে আসছিল; আকাশটা পশ্চিম দিকে তখনো বেশ উজ্জ্বল, ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছিল। টিম্‌টিম্ করে জ্বলছিল রাস্তার আলোগুলো। বাঁ দিকের তীরে, জেটি বরাবর আমি যাচ্ছিলাম পঁ দেজার অভিমুখে। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বইয়ের স্টলের ভিড় চিরে চিক্‌মিকে সেইন্ নদী বয়ে চলছিল। জেটির ওপর লোক নেই বললেই চলে; গোটা পারী নগরী ডিনারে বসে গিয়েছে। একরাশ ধুলোমাখা হলদে-পাতা মাড়িয়ে আমি যাচ্ছিলাম. আর মনে

পড়ছিল গ্রীষ্মকালের কথা। পথের একটা আলো ছেড়ে অন্যটায় যাবার অবসরটুকুতে দেখছিলাম, ধীরে ধীরে আকাশ কেমন ছেয়ে যাচ্ছিল তারায় তারায়। সব কেমন মৌন হয়ে উঠছিল, ক্রমশই· আমি লক্ষ্য করে ভারি আনন্দ পাচ্ছিলাম। সেই সাথে ফিরে আসছিল সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা, পারী নগরীর শূন্যতা। ভারি ভাল লাগছিল। সারাটা দিন বেশ কেটেছে: একটি অন্ধ, আদালতে—প্রত্যাশিত একটি মেয়াদ-কমতি, আমার উমেদারের পক্ষ থেকে সকৃতজ্ঞ করমর্দন, কয়েকটি দাক্ষিণ্য আর, বিকেলবেলা কয়েকটি বন্ধুর কাছে শাসক-মণ্ডলীর হৃদয়হীনতা আর আমাদের নেতৃস্থানীয়দের ভণ্ডামি বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত এক অচিন্ত্যপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলাম।

সোজা গিয়ে হাজির হলাম জনমানবশূন্য পঁ দেজার ব্রীজের ওপর, সেখান থেকে ঝুঁকে রাতের অন্ধকারে অপস্য়মান নদী দেখতে চেষ্টা করছিলাম। ভ্যার-গালাঁর স্ট্যাচুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে আমার মনে হচ্ছিল সেইন্ নদীর দ্বীপটির একচ্ছত্র অধিনায়ক। স্পষ্ট অনুভব করলাম, আমার অন্তরে উত্থিত হচ্ছে বিশাল এক শক্তি—কি বলে তাকে অভিহিত করব যে, জানি না—আর উত্থিত হচ্ছে অনুভব করলাম পূর্ণতার এক প্রৈতি যা আমায় উল্লসিত করে তুলল। সোজা টান্‌টান্ হয়ে দাঁড়িয়ে সবে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছি—সন্তুষ্টির পরিচায়ক সিগারেট—এমন সময়, ঠিক তখুনি পিছন থেকে শুনলাম এক অট্টহাসি। চকিত হয়ে চট করে ঘুরে দাঁড়ালাম; কাউকে দেখতে পেলাম না। ঝুঁকে দেখলাম রেলিঙের বাইরে; কোনো বজরা বা নৌকোর চিহ্নমাত্র নেই। আবার ফিরে দাঁড়ালাম দ্বীপের মুখোমুখি, অমনি আবার শুনলাম পেছন থেকে সেই হাসি, এবার একটু দূরে, যেন স্রোতের তোড়ে ভেসে চলেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। হাসির আওয়াজ ক্রমেই কমে আসতে লাগল, তবু স্পষ্ট তা' আমার পেছন থেকে শোনা যেতে লাগল, মনে হল জল ছাড়া অন্য কোনখান থেকে তা আসা অসম্ভব। সেই সাথেই প্রত্যক্ষ

করতে লাগলাম আমার হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন। দোহাই আমায় ভুল বুঝবেন না। হাসিটার ভেতর রহস্যজনক কিছুই ছিল না, ভারি সহৃদয়, প্রাণখোলা, বলতে গেলে অন্তরঙ্গ হাসি যার মাঝে কোন গোলমালই ছিল না। কিছুক্ষণ বাদেই আর সে হাসি আমি শুনতে পেলাম না। জেটির ওপর ফিরে গেলাম, গিয়ে উঠলাম দোফিন্ সড়কে, অকারণে কিনে ফেললাম এক প্যাকেট সিগারেট। আমার মাথার মধ্যে সবই কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল : আমি হাঁপাতে লাগলাম। ফোন করলাম গিয়ে এক বন্ধুকে, সে বাড়ি ছিল না। বেরিয়ে পড়ব কিনা ইতস্তত করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ শুনলাম, অট্টহাসি—আমার জানালার নীচেই। জানালা খুলে ফেললাম। দেখলাম, কয়েকটি ছোকরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সরবে পরস্পরকে 'শুভ রাত্রি' জানাচ্ছে। জানালা ভেজিয়ে দিতে দিতে আমি অবজ্ঞাভরে কাঁধ ঝাঁকালাম ; হাতে আমার একটা মামলার ব্রীফ ছিল, পড়ে শেষ করতে হবে। বাথরুমে গেলাম একগ্লাস জল খেতে। আয়নায় মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমার প্রতিচ্ছবি, কিন্তু আমার মনে হল কেমন যেন দ্বৈত হাসি আমার প্রতিচ্ছবির মুখে···

কি বললেন ? ওহো, মাফ করুন, অন্য কিছু ভাবছিলাম আমি। কাল বোধহয় আবার আসব আপনার সাথে দেখা করতে। হ্যাঁ, কালই আসব, ঠিক রইল। না, না, আর দেরী করা আমার উচিত হবে না। তাছাড়া, দেখছেন তো, ওই 'বাদামী ভালুক' বেটা ওঁৎ পেতে বসে হাতছানি দিচ্ছে, বোধহয় আমার কাছে কিছু পরামর্শ চায়। ও ভারি ভাল লোক, সত্যিই ভাল, কিন্তু ওর পেছনে স্রেফ বদমাইসির খাতিরে ফেউয়ের মত লেগে গিয়েছে পুলিশ। ওকে কি দেখে মনে হয় ও খুনী ? ও দেখতেও যেমন নিরীহ, কাজেও তাই, বিশ্বাস করুন। ছিঁচকে চুরিতে লোকটা ওস্তাদ, আর শুনলে চমকে উঠবেন, ওই গুহাবাসিন্দাটার পেশা হচ্ছে শিল্পকীর্তি কেনা-বেচা। হল্যাণ্ডে প্রায় সবাই পেন্টিং আর টিউলিপ ফুলের বিশেষজ্ঞ। ওইযে

অমন নিরীহ ওর চেহারা দেখছেন, কিন্তু ও-ই হচ্ছে বহুবিদিত একটি পেন্টিং চুরির জনক। কোন্ পেন্টিংটার? একদিন বলব আপনাকে। অবাক হবেন না এত খবর আমি জানি দেখে। এখানে যদিও আমি একজন অনুতপ্ত-বিচারক হয়েই আছি, তবু আমার ছোটখাট পেশাও আছে বইকি: আইনত, আমি এইসব সাধু মহাত্মাদের পরামর্শ-দাতা। এ দেশের আইন-কানুন বেশ করে আমি পড়ে নিয়েছি, তারপর এই পল্লীতে—যেখানে কোন ডিপ্লোমার প্রয়োজন নেই—আমি খাসা ব্যবসা ফেঁদে বসেছি। উড়ে এসে হঠাৎ করে জুড়ে বসা কি চাট্টিখানি কথা? কিন্তু আমায় দেখেই মনে হয় বেশ নির্ভরযোগ্য লোক, তাই না? সহৃদয় দিল্‌খোলা হাসি আমার, আর প্রাণোচ্ছল আমার করমর্দন, আর এ দুটোই তো হচ্ছে আসল তুরুপ! তা-ছাড়া, দুরূহ কয়েকটি মামলা আমি এসেই মিটিয়ে দিয়েছি, প্রথম প্রথম স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে, তারপর প্রত্যয়ের বশে। ছিঁচকে চোর, ছ্যাচড়া চোরই যদি সর্বদা শাস্তিভোগ করে আদালতে, তবে অন্যান্য সকলেরই ধারণা হবে তাঁরা চিরকালই যা কিছুই করুন না, নির্দোষ থেকে যাবেন। তাই না, সুহৃদ্বরেষু? আর আমার মতে—বেশ তো, বেশ তো, আমিও আসছি!—এই আত্মপ্রত্যয়টি কখনোই কোনমতেই, জন্মাতে দেওয়া উচিত নয়। তাহলে সবটাই নিছক পরিহাসে পর্যবসিত হবে।

## তিন

আপনার অনুসন্ধিৎসার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আপনার কাছে, সুহৃদ দেশোয়ালি ভাই! আর যাই হোক, আমার কাহিনীতে অসাধারণত্ব নেই কোথাও। তবে আপনি যখন জানতে উৎসুক, আপনাকে আমি বলছি, সেই হাসি সম্বন্ধে কয়েকদিন আমি বেশ ভাবলাম, তারপর সে কথা ভুলেই গেলাম। বহুদিন বাদে বাদে নিজের মধ্যেই যেন শুনতে পেতাম সেই হাসি। তবু, বেশীর ভাগ সময়ই, বিনা চেষ্টায় আমি মশগুল থাকতাম আরো অনেক রকম চিন্তায়।

তবু, আপনার কাছে বলতে বাধা নেই, পারী নগরীর জেটি দিয়ে চলা-ফেরা করাই আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। যখনই মোটর কিংবা বাসে ও-পথে পাড়ি দিয়েছি, অন্তরে নেমে আসতে দেখেছি কেমন যেন এক স্তব্ধতা। আমার মনে হয়, কোন কিছুর আমি প্রতীক্ষা করছিলাম। সেইন্ নদী পেরিয়ে যেতাম, কোনকিছুই না ঘটতে দেখে আবার স্বাভাবিক হয়ে আসত আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস। সে সময় আমার স্বাস্থ্যেরও কি একটা গণ্ডগোল চলছিল। কেমন যেন ভাসা ভাসা ভাব, একটু বিষাদ, হাসিখুশিতে ভরা আগেকার দিনগুলো যেন ফিরে আসতে চাইছিল না। অনেক ডাক্তার দেখালাম, তাঁরা বলবর্ধক ওষুধ দিলেন। খানিকটা সময় প্রাণশক্তি ফিরে পেতাম, আবার বিষণ্ণ হয়ে পড়তাম—এইভাবে চলছিল ওঠা আর পড়া। জীবনটা আর আগের মত সচ্ছল রইল না, শরীর বিষণ্ণ হলে হৃদয় মুসড়ে পড়ে। আমার মনে হলো, আমি ভুলতে বসেছি সেই শিক্ষা যা কোনদিন আমি শিখিনি, তবু যা আমি অত্যন্ত ভালভাবেই

জানতাম—কি করে জীবন যাপন করতে হয়। হ্যাঁ, আমার মনে হয়, এভাবেই হলো সবকিছুর সূত্রপাত।

কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার নিজের মানসিক অবস্থা বিশেষ সুবিধের লাগছে না। মনের কথা খুলে বলতে পর্যন্ত বাধো-বাধো ঠেকছে। মনে হচ্ছে, তেমনভাবে কথা ঠিক বলতেই পারছি না, কথায় আজ কোন গাঁথুনি নেই। বোধহয় আবহাওয়াই এর জন্য দায়ী। দম অবধি নিতে কষ্ট হচ্ছে ; কি ভারি হাওয়া—বুকে রীতিমত চাপ লাগছে। সুহৃদ দেশোয়ালি ভাই, চলুন না, যদি আপত্তি না থাকে, শহরের পথে একটু বেড়িয়ে আসা যাক? ধন্যবাদ।

ক্যানালগুলো কি সুন্দর লাগছে আজ সন্ধ্যায়! আমার ভারি ভাল লাগে এঁদো জলার গন্ধ, ক্যানালের মধ্যে পচা পাতার ভ্যাপসা গন্ধ আর ফুল-বোঝাই বজরাগুলো থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধূপ-ধুনোর সৌরভ। না, না, এর মধ্যে কোনরকম বিকৃত-রুচির ইঙ্গিত নেই, আপনাকে বলে রাখি। বরং ঠিক তার উল্টোই বলতে পারেন, এটা আমার ইচ্ছাকৃত ভাল-লাগা। আসল কথা হলো, এই ক্যানাল-গুলোকে আমি জোর করে ভালবাসতে শুরু করি। জগতের মধ্যে আমার সর্বাধিক প্রিয় স্থান হচ্ছে সিসিলি, বিশেষত এটনা-র চূড়া থেকে যখন তার রৌদ্রকরোজ্জ্বল রূপ দেখি, অবারিত সমুদ্রের মাঝে ওই দ্বীপটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। জাভাও ভাল লাগে, যখন ট্রেড-উইণ্ড বয়। হ্যাঁ, আমার যৌবনকালে সেখানে আমি গিয়েছিলাম। বলতে গেলে, সব দ্বীপই আমি ভালবাসি। একনজরেই পুরো দ্বীপটা দেখা যায়।

চমৎকার বাড়িটা, তাই না? ওই ওপরে যে দুটো মাথা দেখছেন, ও দুটো হচ্ছে নিগ্রো ক্রীতদাসদের। ওটা হলো একটা দোকানের সাইন্। এ বাড়িটা এক ক্রীতদাস-বিক্রেতার ছিল। আগেকার দিনে এদের মন উঠত না সহজে ; আত্মম্ভরিতার চরম

ছিল এরা; প্রকাশ্যে এরা জানিয়ে দিত সবাইকে : 'চেয়ে দেখ চাঁদ, মালদার লোক আমি; ক্রীতদাস কেনা-বেচা করি আমি; কালো মাংসের কারবার করি।' কল্পনাও করতে পারেন কি, আজকের যুগে কেউ প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে, সে এই ব্যবসা করে? কী কেলেঙ্কারিই না ঘটে যাবে! এখনো আমার পারী শহরের বন্ধুদের কথা স্পষ্ট আমি শুনতে পাই। এ বিষয়ে তারা বদ্ধপরিকর ছিল; দুই-তিনটি ইস্তাহার পর্যন্ত তারা জারি করতে পেছপা হয় নি, তার বেশীতেও আপত্তি ছিল না। বহু ভেবে আমিও তাদের সাথে স্বাক্ষর করেছিলাম। দাসত্ব?—মোটেই না, আমরা তার বিরুদ্ধে। আমাদের ঘরে ঘরে, কল-কারখানায় নিরুপায় হয়ে দাস রাখা হচ্ছে—তা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তাই নিয়ে দম্ভ করতে যাওয়া মানে সহ্যের সীমা অতিক্রম করা!

এ কথা আমি বেশ বুঝি যে মানুষকে হয় প্রভুত্ব করতে হবে, নয়তো সেবার ব্রত নিতে হবে। মানুষের যেরকম মুক্ত বাতাসের প্রয়োজন, তেমনিই তার দাসেরও প্রয়োজন। হুকুম করাই বেঁচে থাকা—আমার এ বিশ্বাসে আপনার সায় আছে? তবু, জগতে সবচেয়ে যে বিপন্ন, সে পর্যন্ত বেঁচে আছে। সমাজের নিম্নতম যে মানুষটি, তারও তো আছে বউ, কিংবা ছেলে। সে যদি অবিবাহিত হয়, কুকুর। আদত কথা কি জানেন, জীবনে একজন অন্তত থাকা চাই যার ওপর চোখ রাঙালেও, রুখে রেগে ওঠবার যার অধিকার নেই। 'নিজের বাপের কথায় কারো রুখে ওঠবার অধিকার নেই'—এ কথাটা আপনার জানা আছে নিশ্চয়? একদিক দিয়ে কথাটা ভারি বেখাপ্পা। কার ওপর তবে রুখে উঠবে মানুষ, যদি আপনার লোকদের ওপরেই না পারে? আবার, অন্যদিক দিয়ে কথাটা প্রণিধানযোগ্যও বটে। কেউ না কেউ যদি চরম কথাটি না বলতে পারে, তবে যুক্তির ওপর যুক্তি বসাতে বসাতে মানুষ কোনদিন কোন সমাধানেই আসতে পারবে না। আবার, ক্ষমতা

দিয়েই সবকিছুর চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেওয়া যায়। এ সত্যটুকু আমাদের বুঝতে দেরি হলেও, বুঝেছি। উদাহরণস্বরূপ, দেখে থাকবেন, দার্শনিক কচকচির সময় আমাদের এই প্রাচীন ইউরোপ কোনদিন পথ ভুল করে নি। আজকাল আর আমরা সেকালের মত বলি না, 'এই হলো আমার মত ; তোমার এতে আপত্তি কি কি ?' আমরা ফিরে পেয়েছি আমাদের বিবেক বুদ্ধি। বিল পাশ করানোর বদলে আমরা বেছে নিয়েছি আলোচনার পথ। 'এই হলো আদত কথা', আমরা আজকাল বলি, 'যত খুশি আলোচনা করে দেখুন কথাটা ; আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই পুলিশ আপনাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে, আমার কথাই ঠিক।'

হায় এই প্রাচীনা মেদিনী! সবই আজ জানা হয়ে গেছে। পরস্পরকে আমরা চিনি আজ, আমরা জানি কতদূর আমাদের পক্ষে করা সম্ভব। উদাহরণ বদলাই, যদি আমার কথাই ধরি, দেখুন না, আমি বরাবর চেয়ে এসেছি যে আমার কাছে যারা কাজ করতে আসবে, হাসিমুখে কাজ করবে। ধরুন, যদি কোনদিন দেখলাম, আমার ঝি মুখ গোমড়া করে আছে, আমার সারাটা দিন বিষিয়ে উঠত। অবশ্য হাসিখুশি থাকা না থাকাটা ওর ইচ্ছাধীন নিশ্চয়ই। কিন্তু নিজেকেই আমি বোঝাতাম যে ওর উচিত হচ্ছে আপন কর্তব্যটুকু হাসিমুখেই সাধিত করা, কাঁদতে কাঁদতে করবার বদলে। অন্তত, আমার দিক দিয়ে সেটাই শ্রেয়। তবু, দম্ভ করছি না, আমার যুক্তিতে কোন মূর্খতা ছিল না। এই কারণেই, কোনদিন আমার ধাতে সইত না চীনে রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়া। কেন? কারণ, প্রাচ্যদেশীয়েরা যখনই চুপ করে থাকে আর শ্বেতাঙ্গদের সান্নিধ্যে আসে, প্রায়ই ওদের মুখে জেগে ওঠে ঘৃণার ভাব। আর খাবার পরিবেষণের সময়ও অমনি মুখ ভারি করেই ওরা খেতে দেয়। কোন্ প্রাণে তখন আপনি মুরগীর আস্বাদ তারিফ করবেন বলুন দেখি?

আর, তার চেয়েও বড় কথা, ওদের ওই মুখের পানে তাকিয়েও কি আপনার মনে হবে যে আপনি নির্দোষ?

আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে তাই দাসত্ব—যথাসম্ভব সহাস্য বদনেই—অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাকে আমল দিলে চলবে না। কি মজার কথা বলুন তো—যাদের দাস বিনা এক পাও চলে না, তারাই নিজেদের অভিহিত করে স্বাধীন মানুষ বলে। প্রথমত, এটা একটা ঠাট বিশেষ, দ্বিতীয়ত, এদের নিরাশ না করবার খাতিরে। ওসব লোককে এটুকু সান্ত্বনা আমাদের দেওয়া উচিত, তাই না? তবেই না এদের মুখের হাসি বজায় থাকবে, আর আমরা বিবেক দংশনের হাত থেকে রেহাই পাব। তা নয়তো, আমাদের পালটে নিতে হয় নিজেদের সম্বন্ধে তামাম মতামত। দুর্ভোগের আমাদের ইয়ত্তা থাকত না কিংবা হয়তো আমরা রাতারাতি খুব বিনয়ী হয়ে পড়তাম—কারণ কে জানে কখন কি ঘটে যাবে? সেই জন্যেই না দোকানের সাইন ব্যবহার না করাই ভাল; এই সাইনটা বড্ড বেশী ভয়ানক ঠেকে। তা ছাড়া, রাজ্যসুদ্ধ লোক যদি এসে নিজের নিজের পেটের কথা ফাঁস করতে শুরু করে, তার কি পেশা, কোথায় ঘর ইত্যাদির বিবরণ দিতে বসে, তবে কি আমরা পালানোর পথ খুঁজে পাব, ভেবেছেন? ধরুন, কারো ভিজিটিং কার্ডে লেখা রইল: দ্যুপঁ, বন্য-নাচের দার্শনিক, কিংবা খ্রীশ্চান জমিদার, কিংবা ব্যভিচারী মানব-প্রেমিক—যার যা খুশি তা বেছে নেওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তবে কেমন নরকগুলজারটি হবে বলুন তো? বটেই তো, আমার মনে হয় নরক এর চেয়ে কারো কাছে খারাপ লাগবে না, নরকেও বোধহয় রাস্তা-বোঝাই কেবল দোকানের সাইন-বোর্ড, আর কারো সাধ্য নেই নিজের মনের কথা বুঝিয়ে বলে। মানুষের একটা পরিচয় একবার জানা গেল তো সেই গোত্রেই তাকে পচতে হবে আজীবন।

ধরুন আপনিই, সুহৃদ দেশোয়ালি ভাই, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবতে শুরু করলেন, আপনার সাইন-বোর্ড সেখানে না জানি কেমন

হবে। সেকি, চুপ করে গেলেন কেন? বেশতো, ভেবে পরে বলবেন 'খন। আমারটা কি হবে, আপনাকে বলে দিতে পারি। জানুস দেবতার সুন্দর দু-মুখো একটা ছবি, আর তার ওপর বাড়ির ইষ্টমন্ত্রঃ 'এঁকে বিশ্বাস করবেন না।' আমার ভিজিটিং কার্ডে লেখা থাকবে: 'জাঁ-বাপ্তিস্ত্ ক্লামাঁস, মঞ্চের অভিনেতা।' জানেন, সেই যে সন্ধ্যার কথা আপনাকে বলেছি, তার অনতিকাল পরেই একটা জিনিস আমি আবিষ্কার করি। যখনই কোন অন্ধকে আমি রাস্তা পার করে দিতাম, আমার টুপি তার গায়ে ছুঁইয়ে আসতাম। যদিও এই টুপিছোঁয়ানোটা তার দিক দিয়ে অবাস্তব কারণ সেতো আর দেখতে পাচ্ছে না আমি কি করলাম না করলাম। তবে, কার মুখ চেয়ে ও কাজটা করতাম আমি? জনসাধারণের উদ্দেশ্যে। অভিনয়ের শেষে দর্শকবৃন্দকে অভিবাদন জানাব না? মন্দ বুদ্ধি নয়, কি বলেন? সেই সময়েই, আর একদিন এক মোটর-যাত্রীকে সাহায্য করবার দরুন তিনি আমায় যখন ধন্যবাদ জানালেন, আমি বললাম কেউই তাঁর জন্যে এতটা ঝক্কি পোয়াত না। অবশ্য, আমি বলতে চেয়েছিলাম, যে-কেউই এ ঝক্কি সানন্দে পোয়াত। কিন্তু মুখ ফসকে যে কথাটা বলে ফেললাম, আমার মনের ওপর তা গুরুভার চাপিয়ে দিল। কারণ আমার চেয়ে বড় বিনয়ী কোনদিন আমার অন্তত চোখে পড়ে নি।

সুহৃদ দেশোয়ালি ভাই, নম্রভাবেই আপনার কাছে আমি স্বীকার করছি যে সর্বদাই আমি দেমাকে টইটুম্বুর থাকতাম। আমি, আমি, আমি, হচ্ছে আমার সারাটা জীবনের ধুয়ো এবং যা কিছু আমি বলতাম, সর্বত্রই তা অত্যন্ত বড় করে শোনা যেত। বড়াই করে ছাড়া কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল, যদিও আমার মত সবকিছু ঢেকেঢুকে গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা কম লোকেরই ছিল। এ কথা মানতেই হবে যে আমি বরাবর ক্ষমতার উচ্চ শিখরেই স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এসেছি। আমার সমকক্ষ কেউ ছিল না।

বলেই বোধহয় আমি সানন্দে সবার সঙ্গে মিতালি করে বেড়াতাম। নিজেকে অহর্নিশি আমি অন্য যে-কারো থেকে বেশী বুদ্ধিমান বলে মনে করতাম। এ কথা আপনাকে আগেই বলেছি; খালি তাই নয়, বেশী স্পর্শকাতর, বেশী নিপুণ, অব্যর্থ শিকারী, অতি দক্ষ মোটর চালক, অনবদ্য প্রেমিক বলেও মনে করতাম নিজেকে। এমন কি যে সব ক্ষেত্রে আমার অনুষ্ঠানটা সহজেই ধরা পড়ত,—যেমন টেনিসে আমি নেহাৎ চলনসই পার্টনার ছিলাম—আমি অনায়াসে ভাবতাম, সময় যদি পেতাম, সেরা খেলোয়াড়দের হারানো আমার পক্ষে ছেলেখেলা হতো, দেখিয়ে দিতাম। নিজের মধ্যে খালি দেখতাম অসাধারণত্ব, কাজেই আমার সমস্ত শুভেচ্ছা আর স্থৈর্যের মর্মও আপনার বুঝতে অসুবিধে হবে না। অন্যের কথা আমি চিন্তা করতাম, নিছক করুণা পরবশ, স্বাধীনচেতার ঔদার্য নিয়ে, তার সমস্ত কৃতিত্বই একান্ত আমার, আমার আত্মপ্রসাদের ভাবটা এককাঠি চড়ে যেত।

যে সন্ধ্যার কথা আপনাকে আমি বলেছি, তার পিঠপিঠই আরো কয়েকটি তথ্যের সাথে এই সত্যগুলো আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সবকটিই একসঙ্গে কিংবা খুব পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয় নি। প্রথমে আমার কাজ হয়, স্মৃতিশক্তির পুনরুদ্ধার করা। ধীরে ধীরে স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হয়ে উঠল সবকিছু। যা কিছু আমি অল্প স্বল্প জানতাম, ক্রমে তা শিখতে শুরু করলাম। তার আগে অবধি আমার সহায় ছিল অসাধারণ এক বিস্মরণশক্তি। সবকথাই আমি ভুলে যেতাম, এমন কি নিজের সঙ্কল্পের কথাও। মূলত, এতে কোনই ক্ষতি হতো না। পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়ে যুদ্ধ, আত্মহত্যা, প্রেম, দারিদ্র্য—এসবের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হতো, তবে অত্যন্ত অগভীর সে দৃষ্টির মমত্ববোধ। আমার দৈনন্দিন জীবনের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই, এমন সব বিষয় সম্বন্ধে কখনো কখনো আমি উত্তেজিত হবার ভাণ করতাম। কিন্তু আদৌ সে সবে আমার

কিছু এসে যেত না যদি না আমার স্বাধীনতা তাতে ব্যাহত হতো। কি করে মনের কথা বুঝিয়ে বলি আপনাকে? সবকিছু গড়িয়ে চলত—স্বচ্ছন্দে আমার পাশ কাটিয়ে যেত।

দেখুন, নিজেকে বড় বেশী অভিযুক্ত করছি: কখনো কখনো আমার বিস্মরণ শক্তিকে প্রশংসাও করতে হয় বইকি। এক একজন লোক থাকে দেখেছেন, যাদের পরম ধর্মই হচ্ছে ক্ষমা, আর সত্যিই যারা ক্ষমা করতে ওস্তাদ হলেও অন্যের ভুল ভুলে যেতে তারা অপারগ? অন্যে যদি আমায় অপমান করত, আমি ক্ষমা করতে পারতাম না সহজে, কিন্তু অল্পদিনেই সবকথা আমি ভুলে যেতাম। কিন্তু যে জন দোষী, সে ভাবত আমি তার বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করছি, তাই সে তাজ্জব ব'নে যেত, যখন তার গা ছুঁয়ে টুপি নেড়ে তাকে জানাতাম স্মিত সহাস্য অভিবাদন। তার প্রকৃতি অনুযায়ী সে আমার স্বভাবের ঔদার্য দেখে অভিভূত কিংবা আমার অভব্য আচরণে রুষ্ট হয়ে উঠলেও বুঝতে পারত না, আমার পথ আরো অনেক সরল। যে দোষে লোকে আমায় অসামাজিক বা অকৃতজ্ঞ মনে করত, সেই অক্ষমতাই আমায় সময় বিশেষে করে তুলত অলোকসামান্য।

আমার মধ্যে আর কোন অবিচ্ছিন্ন ধারা স্থান পেত না, একমাত্র দিনের পর দিন প্রবহমান আমি, আমি, আমি। নারীসঙ্গে কোন দিন ভাবতাম না পরের দিন কি হবে, ভাবতাম না পরের দিন কি হবে পাপ বা পুণ্যকর্মে নিমজ্জিত থাকতাম যখন, প্রতিটি দিন ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, কুকুরদের মত—কিন্তু প্রতিদিনের আমি নিঃশঙ্কভাবে আমিই থাকত। এভাবেই আমি জীবনের বাহ্যদেশে বেশ এগিয়ে চলছিলাম, কথার জগতেই ছিল আমার জগৎ, সত্যের বাস্তবতায় নয়। কোন বই ভালভাবে না পড়ে, কোন বন্ধুকে ভালভাবে ভাল না বেসে, কোন দেশ ভালভাবে না দেখে, কোন নারীকে ভালভাবে না পেয়ে—চলছিল আমার দিনগুলো! দারুণ বিরক্তির কিংবা

অন্যমনস্কতার মাঝে আমি ভেসে চলেছিলাম অর্থহীন জীবনের স্রোতে। তারপর দেখা দিল সত্যিকার মানুষেরা ; তারা চাইল একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে অবলম্বন স্বরূপ, কিন্তু কোন অবলম্বনই ছিল না, সেই হলো চরম দুর্ভাগ্য। তাদের দুর্ভাগ্য। নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা আমি তো মনে রাখতাম না।

কিন্তু ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল আমার স্মৃতিশক্তি। কিংবা, আমি ফিরে চললাম স্মরণের পথে। আর সেই সাথে দেখা হয়ে গেল একটি স্মৃতির সাথে, যা আমার জন্যেই যেন ওৎ পেতে প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু সে কথা বলবার আগে আপনাকে আমি বলে রাখতে চাই, সুহৃদ দেশোয়ালি ভাই, দু-চারটে অভিজ্ঞতার কথা ( যা আপনার কাজে লাগবে নির্ঘাৎ ) আমার গবেষণাকালে যে সব আবিষ্কার আমি করেছিলাম, তারই মঞ্জুষা থেকে।

একদিন, আমার মোটরে চড়ে মন্থর গতিতে যখন একটা সবুজ আলোর নিশানা পার হচ্ছি আর পেছনে শুনছি আমার ধৈর্যশীল সহনাগরিকদের মোটরের হর্ণ তারস্বরে বাজতে, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল আর একদিনের এমনি পরিস্থিতির কথা। 'প্লাস-ফোর' নিকারবোকার পরা, চশমা চোখে এক রোগা মোটর সাইকেল আরোহী আমার গাড়ির পাশে একটা চক্কর মেরে একটা লাল আলোর নিশানা এলাকায় গিয়ে ঠিক আমাব সামনেই থামল। থামা মাত্র বেচারার এঞ্জিনটা থেমে গেল, আর স্টার্ট দেবার বিফল প্রয়াসে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠল লোকটা। আলোর নিশানা বদলে গেলে, আমার স্বভাবসুলভ সৌজন্যতার সাথে লোকটাকে অনুরোধ করলাম, পথ ছেড়ে দিতে—আমি তা হলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এঞ্জিনের বেয়াদপির সাথে সাথে লোকটারও মেজাজ চড়ছিল। তাই সে জবাব দিল, পারী নগরীর সৌজন্য অনুসারে, আমি এখন গাছে চড়ে বসি যেন! একটু অধীর হয়েই যথেষ্ট বিনয়ের সাথে তবু আমি ওকে অনুরোধ করলাম, পথ ছেড়ে

দিতে। খামকা লোকটা আমায় পরিষ্কার ভাষায় বলে বসল, 'তবে নরকে যান!' ইতিমধ্যে আমার পেছনে অনেকগুলো মোটরেরই ভীড় জমে গিয়েছে; তারস্বরে হর্ণ বাজছে। দৃঢ়তর গলায় আমি লোকটিকে অনুরোধ জানালাম ভদ্রতার সীমা অতিক্রম না করতে, আর লোকজন গাড়ি ঘোড়ার চলাচল তার জন্য বন্ধ হতে বসেছে— সেদিকে হুঁস রাখতে। বোধহয় এঞ্জিনের একগুঁয়েমীতে মেজাজ আরো চড়ে গিয়েছিল ওর, আমায় আমন্ত্রণ জানাল নেমে আসতে, মেরে নাকি ও আমার হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে! এমন নিরাশাবাদী মন্তব্য শুনলে বরাবরই আমার মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যেত শুভঙ্কর এক উদ্দীপনায়; তাই আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম, দুর্মুখটাকে শিক্ষা দেব বলে। কোনদিন নিজেকে আমি ভীতু ভাবি নি (মানুষ কত কী-ই না ভাবে!); আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে বেশ লম্বা আমি, আর আমার পেশীতে বলের ঘাটতি কোনদিন ছিল না। লোকটা হাড় গুঁড়িয়ে দেবে কি নেবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু রাস্তায় নামতে না নামতে, ভিড়ের ভেতর থেকে একটা লোক তীরবেগে আমার দিকে এগিয়ে এল, পৃথিবীতে আমি ঘৃণ্যতম জীব ছাড়া আর কিছু নই ইত্যাদি সম্বোধনে আমায় ভূষিত করল, আর জানাল যে পায়ের ফাঁকে মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নিরুপায় ওই লোকটাকে কিছুতেই সে মারতে দেবে না। বাহাদুর ওই পরোপকারীর দিকে ফিরে দাঁড়ালাম, কিন্তু কোথাও আর তাঁর টিকি দেখতে পেলাম না; তবে আমি ওর দিকে ফিরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, প্রায় তৎক্ষণাৎ, শুনলাম মোটরসাইকেলের আওয়াজ, আর দারুণ এক আঘাত পেলাম কানের ওপর। কি ঘটল, বুঝে ওঠবার আগেই মোটরসাইকেলটি নাগালের বাইরে চলে গেল। হতবুদ্ধির মত, যন্ত্রচালিতবৎ আমি যেই অগ্রসর হলাম মূর্তিমান দার্তাইয়াঁ-র দিকে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঐকতানে বেজে উঠল আমার পেছনে অপেক্ষমান অসংখ্য গাড়ির হর্ণগুলো। আলোর

নিশানা সবুজ হয়ে গেল ; তখনো, কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে, আমার পথরোধকারী সেই ব্যাটা নরাধমকে বেশ দু ঘা লাগানোর পরিবর্তে, ভাল ছেলের মত উঠে গেলাম নিজের গাড়িতে, স্টার্ট দিলাম, গাড়ি ছাড়বার সাথে সাথে পাশ থেকে নরাধমটা আমায় অভিনন্দিত করল 'বোকা গাধা কোথাকার!' বলে। এখনো তা আমার কানে বাজছে।

অত্যন্ত অর্থহীন কাহিনী, কি বলেন ? হয়তো তাই। তবু এ-কথা ভুলতে আমায় বেশ বেগ পেতে হয়েছিল ; আর, সেটাই হলো আদত কথা। তবু মনকে চোখ ঠারানোর ছুতো আমার প্রচুর ছিল। বিনা বাক্যব্যয়ে নিজেকে আক্রান্ত হবার সুযোগ যে দিলাম, তার মধ্যে ছিল না তিলমাত্র ভীরুতা। দুদিক থেকে ডাক শুনে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম আমি, তার ওপর সোনায় সোহাগা হলো মোটর হর্ণগুলো বেজে ওঠাতে। তবু মনে আমার দারুণ অশান্তি হতে লাগল, যেন আমি মর্যাদার রীতি বিরুদ্ধ কিছু অপরাধ করেছি! স্পষ্ট চোখে দেখতে পেতাম—কেমন নির্বিকার চিত্তে পালিয়ে গেলাম আমি গাড়ির ভেতর, একপাল লোকের পুলকিত ব্যঙ্গোচ্ছল দৃষ্টির বাণে জর্জরিত হয়ে, দর্শকেরা আরো পুলকিত হয়েছিল কারণ আমার পরণে ছিল অত্যন্ত কেতা-দুরস্ত একটা নীল স্যুট। কানে আমার স্পষ্ট বাজত, 'বোকা গাধা কোথাকার!' আর মনে হতো, কথাটার ভেতর মিথ্যা বেশি নেই। মোট কথা, আমার জনপ্রিয়তা যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেল! তার মূলে ছিল কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পরম্পরা, যদিও কখনোই ঘটনা পরম্পরার কোথাও অভাব ঘটে না। পরে আমি ভেবে দেখেছি, আমার একমাত্র কর্তব্য তখন কি ছিল। দেখতে পেতাম, এক ঘুষিতে কাৎ করে দিয়েছি মূর্তিমান দার্তাইয়াঁ-কে, উঠে পড়েছি আমার গাড়িতে, আমায় মেরে পলায়মান সেই বাঁদরটার পেছনে ধাওয়া করেছি, দেখতে দেখতে তাকে ধরে ফেলে তার মোটরসাইকেলটা আছড়ে ফেলেছি ফুটপাথের ওপর, তারপর

ব্যাটাকে দিয়েছি তার সাধ মাফিক জবর উত্তমমধ্যম। একটু আধটু পরিবর্তন করে, ছোটখাট এই ফিল্মটা আমি একশো বার চালিয়ে দিতাম কল্পনার পটে। কিন্তু চোর পালালে যদি বুদ্ধি বাড়ে, তা হলে দিনের পর দিন অনির্বচনীয় অনুশোচনায় পুড়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

আঃ, আবার বৃষ্টি শুরু হলো। চলুন না, ওই বারান্দার তলায় একটু দাঁড়ানো যাক, কি বলেন ? বেশ। তারপর, কোন্ অবধি যেন বললাম ? ওহো, হ্যাঁ, সম্মান! হুঁ, তারপর যখনই মনে পড়ে গিয়েছে সেদিনের কথা, তার অর্থটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে আমার দেরি হয় নি। যা কিছু স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম, তার কোনটাই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে নি। স্পষ্ট এখন বুঝতে পারি, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম সম্পূর্ণ এক মানুষ হয়ে ওঠবার, যে সর্বত্র সম্মানিত হবে, কি মানুষ হিসেবে, কি তার পদমর্যাদায়। আধা সের্দা, আধা ছ্য গল্ আর কি। মোট কথা, আমি চেয়েছিলাম, সবকিছুই নিজের অধীন রাখতে। কাজেই আমায় সর্বদা কেতাদুরস্ত থাকতে হতো, মানসিক বিত্তের চেয়ে শারীরিক নৈপুণ্য আমায় তাই বেশী প্রদর্শন করতে হতো। কিন্তু নির্বিকার চিত্তে যেদিন প্রকাশ্য অপমান আমি মেনে নিলাম, নিজের সেই নিখুঁত ছবিটা মনের কাছে ফলাও করে ধরাটা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। সত্যের এবং মননশীলতারই যদি অনুরাগী হতাম আমি, তবে সেদিনের ওই ঘটনাটুকুতে অত বিচলিত হবার কি ছিল ? যারা সেদিন দর্শকের ভূমিকায় ছিল, তারা তো সহজেই সে কথা ভুলে মেরে দিয়েছে। মিছামিছি রেগে ওঠার অভিযোগে আর, সেই রেগে ওঠার প্রতিফলের সম্মুখীন না হতে পারবার অভিযোগে, উপস্থিত বুদ্ধির অভাব-হেতু নিজেকে আমি দোষী মনে করতে পারতাম। তার বদলে কিনা প্রতিশোধ নিতে চাইলাম আমি, চাইলাম সম্মুখ রণে অবতীর্ণ হয়ে জয়লাভ করতে। যেন পৃথিবীতে আমার সত্যকার বাসনা এই নয় যে বুদ্ধিমানদের সেরা

হব আমি, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশী উদার হব,—তার বদলে কিনা চাইলাম প্রতিপক্ষকে উত্তমমধ্যম দিতে, গায়ের জোরে জিততে, একেবারে আদিমতম উপায়ে। এর অন্তর্নিহিত সত্য হলো, প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকই বোধহয় স্বপ্ন দেখে, সে বেশ একটা ভারিক্কি দলপতি হয়ে উঠেছে, সমাজের ওপর বিস্তার করেছে একাধিপত্য—নিছক গায়ের জোরে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ে যত সহজে এ কথা বিশ্বাস করা চলে, তত সহজ ব্যাপারটা নয়, তাই শরণাপন্ন হতে হয় রাজনীতির এবং নির্দয়তম পার্টির সভ্য হতে হয় সাত তাড়াতাড়ি। নিজের মনকে অপমান করেও যদি অন্যদের ওপর প্রভুত্ব অর্জন করা যায়, ক্ষতিটা কি? নিজের মাঝেই আমি আবিষ্কার করে বসলাম স্বেচ্ছাচারীর কত না রঙীন স্বপ্ন।

শেষ পর্যন্ত, বুঝলাম আমি নিজেও অপরাধীদের দলে, অভিযুক্ত-দের পর্যায়ভুক্ত, তাদেরই সমগোত্রীয়—যাদের কোন অপরাধ এখনো আমার বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি। তাদের অপরাধে আমি বাগ্মিয় হয়ে উঠতে পেরেছি এতকাল কারণ আমি নিজে তো তাদের ক্রীড়নক হই নি কখনো। আমায় যখন শাসানোই হলো, মনে মনে খালি নিজেকে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হলাম না, আরো কিছু করে বসলাম। হয়ে বসলাম এক কোপনস্বভাব মনিব যে তার প্রতিপন্থীকে, আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে, চায় আঘাত হানতে, চায় তাকে পদানত করতে। এর পরে, বলুন আপনি, সুহৃদ দেশোয়ালি ভাই, কোন্ প্রাণে নিজেকে বলি আমি ন্যায়ানুরাগী, নিজেকে মনে করি অসহায় বিধবা আর অনাথদের পূর্ব নির্ধারিত পক্ষ সমর্থক?

বৃষ্টি যখন আরো জোরেই নামল, হাতেও যখন সময় আছে, আমার স্মৃতির জগতে অনতিকাল পরেই যে আবিষ্কার আমি করেছিলাম, তার অন্য একটির কথা আপনাকে বলি? এই বেঞ্চটা বৃষ্টির নাগালের বাইরে, আসুন, বসা যাক। শতাব্দীর পর শতাব্দী

ধরে ধূমপায়ীরা পাইপ জ্বেলে, এখানে বসে একই ক্যানালের ওপর ঝরে পড়া একই বৃষ্টির ধারা দেখে আসছে। আপনাকে এবার যা বলছি, একটু বেশী দুরূহ। বিষয়টা, নারীঘটিত। প্রথমেই আপনাকে বলে রাখা ভাল যে নারী প্রসঙ্গে চিরটা কালই আমি অত্যন্ত সফলকাম—বলতে গেলে, সে সাফল্য প্রায় অনায়াস-প্রসূতই। সে সফলতা অবশ্য তাদের সুখী করবার বা তাদের পেয়ে নিজেকে সুখী করবার পরিচায়ক নয়। না মশাই, নিছক সাফল্যই। যখনি আমি যাকে চেয়েছি, চাইতে না চাইতেই পেয়েছি। আমার মধ্যে নাকি কি এক মোহন শক্তি ছিল। দেখুন দেখি! মোহন শক্তি যে কী বস্তু আপনি তা জানেন ঃ সম্মতিসূচক পরিষ্কার জবাব আদায় করে নেওয়া প্রত্যক্ষ কোন প্রশ্ন না করেই। আর, সে কালে এ কথাটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল বইকি। অবাক হচ্ছেন? দোহাই আপনার, অন্তত, কথাটা যে ভিত্তিহীন, বলবেন না। কারণ আমার এখনকার চেহারায় ওকথা বিশ্বাস না করাই স্বাভাবিক। হায় রে! এমন একটা বয়স আছে যার পরে প্রত্যেকেই সাবধান হয়ে পড়ে নিজের চেহারা দায় অদায় সম্পর্কে। আমার···যাক গে সে কথা! তবে এ কথা সত্যিই—লোকে বলত আমার মাঝে নাকি কি এক মোহন শক্তি ছিল, আর তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেও আমি বিচলিত হতাম না।

অবশ্য কোনরকম পূর্ব-নির্ধারিত অভিসন্ধি আমার কোন কালে ছিল না। যা কিছু করতাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অথবা, করতে চাইতাম সেইভাবে। নারী সান্নিধ্যে আমি ছিলাম স্বাভাবিক, সহজ, নিরঙ্কুশ—ঠিক যেমনটি প্রবাদ বাক্যে বলে। এর মাঝে পাপের ছায়ামাত্র ছিল না, কেবল প্রত্যক্ষ সেই পাপ যাকে শ্রদ্ধাঞ্জলির সাথেই তুলনা করা চলে। তাদের আমি—চিরাচরিত ভাষায়ই বলি—ভালবাসতাম বইকি, অর্থাৎ কিনা তাদের কাউকেও কোনদিন আমি ভালবাসি নি। রমণীবিদ্বেষীদের বরাবর আমি ইতর, মূর্খের সামিল ভেবে এসেছি,

আর জীবনে যত নারীকে আমি কাছে পেয়েছি, প্রত্যেককেই মনে হয়েছে আমার চেয়ে বহুগুণে উন্নত। তবে, আসল কথা কি, এভাবে ওদের আমি খাতিরের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়ে, ওদের অধীন থাকবার বদলে যতটা পারি চুটিয়ে আদায় করেই নিতাম। সে ফন্দীটা ধরবার সাধ্য কারো ছিল কি ?

অবশ্য নিকষিত হেম—সে এক শতাব্দীতে দুটি কি তিনটি ঘটে থাকে বড় জোর। বাদবাকি সবই তো হয় ভ্রান্তি, নয় বিরক্তি। যাই হোক, আমার কথা অন্তত জানি, কোনকালেই পর্তুগীজ সন্ন্যাসিনী হতে চাই নি। উচ্ছ্বাসবিহীন আমি কোনদিনই নই ; সে তো দূরের কথা—বরং অন্তর আমার সর্বদাই করুণাসিক্ত, নয়ন আমার অশ্রু-প্রবণ। কিন্তু আমার আবেগের প্রকাশ আমাকেই কেন্দ্র করে, আমার করুণা আমাতেই সীমিত। তাই বলে, এমন নয় যে কোন দিন কাউকে আমি ভালবাসি নি। জীবনে অন্তত একটি মহৎ প্রেমের বশীভূত আমি হয়েছিলাম, আর তার মোহ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। সেদিক থেকে যদি দেখি, তবে কৈশোরের সেই দারুণ নির্যাতনের অপরিহার্য ধাক্কা খেয়ে আমি এই শিক্ষা পেয়েছি ঃ প্রেমের চেয়ে জীবনে বেশী গুরুত্ব দেওয়া চাই ইন্দ্রিয়াসক্তিকে। তাই আমি সর্বদাই সুখের আর সফলতার অন্বেষণ করে এসেছি। তার ওপর, এপথে আমার ভাগ্যদেবী কম সুপ্রসন্ন ছিলেন না আমার প্রতি ঃ অন্তত খুবসুরৎ একটা চেহারা তিনি দিয়েছেন আমায়। এ জন্য আমার কম গর্ব ছিল না আর নানাপ্রকার আত্মপ্রসাদ এর থেকে আমি উপভোগ করতে পারতাম —অবশ্য এখন আর বুঝতে পারি না, সে সব নিছক দৈহিক সুখের লোভে করতাম, নাকি আত্মমর্যাদার খাতিরে। জানি, আপনি বলবেন, আবার আমি বড়াই করছি। আমি তা অস্বীকার করব না, আর তা না করার দরুন আমি খুব যে গর্বিত, এমনও নয়। এক্ষেত্রে বড়াই যদি আমি করি, তা যথাযথ সঙ্গত কারণেই।

আর যাই হোক, আমার ইন্দ্রিয়াসক্তি ( ওটুকু বলেই ক্ষান্ত হই ) এত অকৃত্রিম ছিল যে মোটে দশ মিনিটের সুখের জন্য আমি নিজের বাপ-মাকে ত্যাগ করতেও পিছপা হব না, পরে, সে যতই অনুতাপ করি না কেন। হব না, বিশেষত দশ মিনিটের সুখ যদি তা হয়, আরো, এই কারণে, যখন জানি যে তার কোন জের টানবার সম্ভাবনা থাকবে না। জীবনে আমার অনেক রকম নীতি ছিল বই কি, যেমন —বন্ধুপত্নীকে কখনো কামনা না করা। কিন্তু যদি কখনো তার ব্যতিক্রম করে থাকি, সে ঘটনার বেশ কয়েক দিন আগে থেকেই সে নারীর স্বামীর সাথে কোন বন্ধুত্বের ভাব যে ছিল, আমার মন থেকে তা মুছে যেত। হয়তো একে ইন্দ্রিয়াসক্তি বলা আমার পক্ষে অনুচিত। ইন্দ্রিয়াসক্তিতে বিতৃষ্ণাজনক কিছু নেই। একটু দয়াপরবশ হয়ে আমরা এটাকে বলতে পারি অক্ষমতা, প্রেমের মাঝে দেহের অতীত আর কিছু না দেখতে পারবার এক সহজাত দুর্বলতা। কিন্তু ভারি সুবিধাজনক ছিল এই অক্ষমতা। আমার বিস্মরণ শক্তির কৃপায়, এর সাহায্যে আমার স্বাধীনতা অবাধ রইল। যে অটল মুক্তি আর যে অলভ্য চেহারা আমি পেয়েছিলাম, তার সাথেই, আমি এইভাবে পেয়েছিলাম নতুন নতুন শিকারের হদিস রাখবার সুযোগ। রোমান্টিক না হবার দরুন, রোমান্সকে আমি আমার দাসে পরিণত করেছিলাম। বোনাপার্তের সঙ্গে আমাদের নারী-বন্ধুদের এই একটি সাদৃশ্য আছে, তারা ভাবে, আর সবাই যেখানে পরাস্ত হয়েছে, তারা অন্তত সেখানে নিশ্চিত বিজয়িনীই হবে।

এই লেনদেনের মাঝে আমার উপরিলাভ হত, আমার জুয়াড়ী মনের তৃপ্তি। মেয়েদের মধ্যে তাদেরই আমার ভারি ভাল লাগত যারা কোন খেলাধূলোয় আমার পার্টনার হতে পারত ; এভাবে বেশ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যেত। দেখুন, বিরক্তি সহ্য করা আমার ধাতে নেই, আমি জীবনের বৈচিত্র্য ষোল আনা উপভোগ করতে ভালবাসি। কোন সমাজেই—তা সে যত আলোকপ্রাপ্তই হোক না কেন—

বেশীক্ষণ আমি সুখী হতে পারি না, আবার আমার পছন্দসই মেয়েদের সান্নিধ্যে কোনদিন আমি বিরক্তির স্বাদ পাই নি। কথাটা বলতেও আমি মরমে মরে যাচ্ছি, তবু জানিয়ে রাখি, সুন্দরী কোন কোরাস-বালিকার সাথে প্রথম দেখা করবার পথ চেয়ে আইনস্টাইনের সাথে দশবার সাক্ষাৎকারের সুযোগ হাতছাড়া করতেও আমি রাজী। তবে, দশম সাক্ষাৎকারে, আমি সত্যিই আইনস্টাইনকে কিংবা কোন গুরুগম্ভীর বই পেলে বর্তে যেতাম। মোদ্দা কথা এই যে বড় বড় সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামানো আমার সইত না; টুকিটাকি সময় কাটানোর অছিলায় ওই যেটুকু না করলে নয়, তার বাইরে যেতাম না। আর, কতদিন দেখেছি, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে করতে ক্রমবর্ধমান তর্কের খেই যেত হারিয়ে—কারণ, হয়তো ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখে পড়ত, কোন অঘটনঘটনপটিয়সী রমণী চলেছেন পথের ওপারে।

তারপর শুরু করতাম খেলানো। জানা ছিল যে, মেয়েরা চায় না, চট্ করে কেউ আদত কথাটা পেড়ে বসে। প্রথমে, চাই খানিক আলাপ, আলোচনা,—ওদের ভাষায়—অনুরক্ত অভিনিবেশ। ওকালতি করে খেতাম, তাই ও-পাটে আমার সহজ একটা অধিকারই ছিল, আর মিলিটারিতে যখন ছিলাম তখন অপেশাদার অভিনেতা হিসেবেও মন্দ খাতির পাই নি বলে নয়নাভিরাম হয়ে ওঠাটাও আমার মকৃশ করাই ছিল। প্রায়ই আমার ভূমিকার পরিবর্তন হলেও নাটকটি একই থেকে যেত। যেমন ধরুন, দুর্বোধ্য আকর্ষণের ছোট্ট অঙ্কটিতে, 'রহস্যময় কি একটা যেন'-র অঙ্কে, 'ভারি অযৌক্তিক ব্যাপারটা, আমি আকর্ষিত হতে চাই নি, হলপ করে বলছি, এমন কি প্রেমের ওপর আমি বীতশ্রদ্ধই হয়ে উঠেছিলাম, ইত্যাদি…'-র অঙ্কে কখনো আমায় বেগ পেতে হয় নি, যদিও আমাদের ঝুলিতে এর চেয়ে পুরণো অজুহাত খুঁজে মেলা ভার। আর একটা অঙ্ক হচ্ছে সেই

রহস্যজনক আনন্দের, যা আর কোন নারীসঙ্গ আপনাকে দিতে পারে নি ইতিপূর্বে। এটা সম্ভবত একটা চোরাগলি,—আলবৎ, চোরাগলিই (কারণ আত্মগোপন করে কাঁহাতক: মানুষ থাকতে পারে, বলুন ? )—কিন্তু এর চেয়ে চমৎকার পন্থা আর মেলা ভার। তা ছাড়াও আমি ছোটখাট এমন হৃদ্য-ভাষণ দিতে পটু হয়েছিলাম যে শুনে আপনি অবধি পুলকিত না হয়ে যাবেন না, আর সে-ই ছিল আমার সাফল্যের মূলমন্ত্র। তবে, প্রধান অঙ্কটি হচ্ছে, করুণ নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রমাণ করতে পারা যে আমি কিছুই নই, আমার সঙ্গে কারো ঘনিষ্ঠতা হওয়া ঝকমারি, দৈনন্দিন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই—জীবন আমার অন্যত্র বাঁধা, দৈনন্দিন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পেতে আমারো কম বাসনা ছিল না, কিন্তু হায়রে, বড় দেরী হয়ে গেছে, আর কি আমার পক্ষে ওসব সাজে! এই যে বিলম্বের কথা বলতাম, তার পেছনে থাকত গোপন উদ্দেশ্য, কারণ বেশ একটা রহস্যের ভাব নিয়েই বিছানায় গিয়ে হাজির হতে পারাই ভাল, এটা আমি জানতাম। তা ছাড়া, একদিক দিয়ে, আমি যা বলতাম তাতে বিশ্বাসও করতাম। নিজের ভূমিকাটাই আমি জীবন্ত করে তুলতাম। ফলে, আমার সঙ্গিনীরা যে সোৎসাহে ফাঁদে পা দিত, তাতে আর আশ্চর্য কি ? তাদের মধ্যে অতি স্পর্শকাতর যারা, তারা চেষ্টা করত আমার মতিগতি অনুধাবন করতে, আর সেই চেষ্টার দরুন তাদের অন্তর ভরে উঠত এক তিক্ত বিষাদে। আমি যে খেলার নিয়মগুলি ভাঙছি না, কাজে হাত দেবার আগে কথা বলে নিচ্ছি, এ-সব দেখে অন্যেরা কিন্তু গায়েপড়েই যথাশীঘ্র সম্ভব আদত প্রসঙ্গের অবতারণা করত। স্পষ্টই দেখতাম, বাজীমাৎ করেছি, দু-দুটো পাখি এক ঢিলে, কারণ, কামনা নিবৃত্তি ছাড়াও, নিজেকে আমি যে ভালবাসতাম, সেই ভালবাসা তৃপ্ত হত—প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে।

এতদূর আমার প্রত্যয় হয়েছিল যে ওদের কেউ যদি সামান্য সুখ

দিয়েই আত্মসম্বরণ করে নিত, তবু তাদের সঙ্গে আমি সম্পর্কচ্ছেদ করতাম না, অনেক দিন বাদে বাদে, দীর্ঘ অনুপস্থিতি প্রসূত লিপ্সা-পরবশ, হঠাৎ যখন দেখা দিতাম, দেখতাম কী দারুণ প্রতীক্ষাই না সেখানে প্রচ্ছন্ন ছিল; আরো পরখ করতে যেতাম—আমার কাছে তারা তখনো বাঁধা আছে কিনা. দেখতাম. সে বাঁধন কঠিন করা না-করা একমাত্র আমার মর্জি। এক এক সময় আমি এতদূর অগ্রসর হয়েছি যে ওদের কাছে কথা আদায় করে নিয়েছি—অন্য কোন পুরুষকে ওরা কোনদিন আমল দেবে না, এভাবে ওইদিক থেকে মনে আর কোন উদ্বেগের অবকাশ থাকত না। কিন্তু আমার হৃদয়,, আমার কল্পনাশক্তি—কোনদিনই তারা উদ্বেগের ধার ধারত না। এমন একটা দম্ভ আমার এসেছিল যে আমার পক্ষে কল্পনা করা পীড়াদায়ক হয়ে উঠত—যে নারী একদা আমার ছিল, সে আর কারো হতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা আমায় কথা দিত, অমনি তারা পড়ত বাঁধা, আর যেতাম বন্ধনমুক্ত হয়ে। যে মুহূর্তে জানাতে পারতাম, আর কোন পুরুষের ঠাঁই নেই ওদের কাছে, অমনি মন আমার উড়ু উড়ু করত, পালিয়ে যেতাম আমি এভাবে না হলে, পালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হত। তাদের কি হল না হল তাতে আমার কিছু এসে যেত না—নিজের আধিপত্যটুকু দীর্ঘকাল বজায় থাকলেই আমি নিশ্চিন্ত। কি বিচিত্র, তাই না? কিন্তু এভাবেই আমি জীবন যাপন করে এসেছি, সুহৃদ দেশোয়ালি ভাই। কেউ কেউ আর্তস্বরে ডাকে: 'আমায় ভালবাস!' আবার অনেকে বলে: 'দোহাই, আমায় ভালবেস না!' কিন্তু আর একদল, এরাই সবচেয়ে হীন আর অসুখী, বলে: 'আমায় ভালবেস না, কিন্তু আমার প্রতি বিশ্বস্ত থেকো!'

এটুকু ছাড়া অন্য কোন প্রমাণের ওপর অবশ্য বিশ্বাস করা চলে না; প্রতি নিয়ত নতুন নতুন মুখের সাথে পরিচয় করতেই হয়। বারবার কেঁচে গণ্ডূষ করবার ফলে, হৃদ্য-ভাষণটা অনায়াসসাধ্য হয়ে

ওঠে। তার জন্য আর ভাবতে হয় না; স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। এইভাবে একদিন দেখা যায় কামনা থাক না থাক, আপনা আপনি হাতে খোরাক এসে পড়ছে। বিশ্বাস করুন, অন্তত এক শ্রেণীর লোক আছে, যা তারা কামনা করে না, তা গ্রহণ না করাটা যাদের পক্ষে জগতের দুরূহতম ব্যাপার।

শেষ পর্যন্ত এমনি ধারাই হল আমার দশাটা তবে কে সেই নারী সে উল্লেখের কোন প্রয়োজনই দেখি না, কিন্তু এটুকু বলব যে তেমন কোন গভীর অনুভূতি আমার না জাগলেও আমি তার প্রতি আকৃষ্ট 'হয়ে পড়েছিলাম তার নিষ্ক্রিয় ক্ষুধার্ত আচরণে। খোলাখুলিই বলছি, আমার কাছে অত্যন্ত জঘন্য এই অভিজ্ঞতাটা ঠেকল। তবে আমার কোনরকম মানসিক জটিলতা না থাকার দরুণ, যাদের সঙ্গে আমার দেখা হত না সচরাচর, তাদের আমি সহজেই ভুলে যেতাম। আমি ভেবেছিলাম, এ মেয়েটা অতসব ভাবনা-চিন্তার পরোয়া করে না, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি, তার নিজস্ব কোন মতামত থাকা সম্ভব। তার ওপর, ওর ওই নিষ্ক্রিয় আচরণে আমার মনে হত, দুনিয়ায় কি ঘটল না ঘটল, তাতে ওর বড় একটা আসে যায় না। কিন্তু তার কয়েক সপ্তাহ বাদেই শুনলাম, কোনও এক তৃতীয় ব্যক্তির কাছে মেয়েটা গল্প করেছে আমার নানাবিধ দুর্বলতা সম্বন্ধে। তখুনি আমার মনে হল, আমার সাথে কেউ যেন প্রতারণা করল। যত নিষ্ক্রিয় ওকে মনে করেছিলাম, তা তো নয়ই, ওর বিচারবুদ্ধিও ছিল টন্‌টনে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসার ভাণ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর রইল না। এমন কি হেসেও আমি ফেললাম; ঘটনাটা নেহাৎ খেলনা। যদি কোন জগতের প্রধান কারণ বিনম্রতা হতে পারে, সে হল কাম জগতের—তার যাবতীয় অপূর্বকল্পিত ফলাফল সমেত। কিন্তু তা নয়, সুযোগ পেলেই আমরা সকলেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করি, তা আমরা যত নির্জনই হইনা কেন। কাঁধ ঝাঁকানোর কথা ছেড়েও যদি দিই, আমার আচরণটা বাস্তবিকই কেমন ধারা

ছিল, বলুন তো? কয়েক দিন বাদেই সেই মেয়েটার কাছে গেলাম, তাকে মোহিত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, চেষ্টা করলাম তার মন ফিরে পেতে। এমন কিছু বেগ পেতে হলো না, কারণ ওদের পক্ষেও পরাজয়ের গ্লানি বহন করে কোন ব্যাপারে ছেদ টানাটা ভারি অস্বস্তিকর। সেই মুহূর্ত থেকেই, ঠিক সজ্ঞানে নয়, আমি শুরু করলাম প্রতি পদে ওকে নির্দয়ভাবে নাজেহাল করতে। ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক হঠাৎ চুকিয়ে দিয়ে আবার ওকে ফিরিয়ে আনতাম, অসঙ্গত স্থানে, অসঙ্গত কালে ওর কাছ থেকে জোর করে সুখ আদায় করতাম, উঠতে-বসতে এমন নির্মম পাশবিক ব্যবহার করতে লাগলাম, যে শেষ অবধি আমিই ওর প্রতি আসক্ত না হয়ে পারলাম না। এমনি এক আসক্তিই বোধহয় গড়ে ওঠে কারাধ্যক্ষ আর কয়েদীর মাঝে। এইভাবেই চলল, যতদিন না নিপীড়নের দুর্বিসহ সুখে উন্মত্তবৎ, মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল তার এই দাসত্বের যে হেতু, তারই প্রশংসায়। সেদিন থেকেই আমি ওর কাছ থেকে সরে আসতে শুরু করলাম। সেই থেকে ওকে আমি ভুলে গেছি।

আপনি এখনও বিনয়বশত যদিও একটি কথাও বলেন নি, তবু আমি আপনার সাথে একমত যে আমার এই আচরণ মোটেই খুব শ্লাঘনীয় নয়। কিন্তু নিজের জীবনের কথাটাই একবার ভেবে দেখুন না, সুহৃদ দেশোয়ালি ভাই! মনের অতলে খুঁজে দেখুন, নির্ঘাৎ এমন একটা কাহিনী আপনিও পেয়ে যাবেন,—পরে শুনব সে কাহিনী। আমার কথা বলি—যখন আমার মনে পড়ল ছোট্ট ওই ঘটনাটা, আবার আমি হেসে উঠলাম। কিন্তু সে হাসি যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের হাসি, যে হাসি আমি শুনেছিলাম পঁ দেজার ব্রীজে। আদালতে বক্তৃতা দিতে দিতে, ওকালতি করতে করতে আমি হেসে উঠতে শুরু করলাম। আদালতে ওকালতি করতে করতেই বেশী হাসতে লাগলাম, নারী-সান্নিধ্যের চেয়ে। অন্তত মেয়েদের কাছে বিশেষ মিথ্যা কথা আমি বলতাম না। আর কোন ভাঁওতা না রেখে

সোজাসুজি মন খুলেই আমি তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলতাম। প্রেমের ভূমিকায় নামাটাই হচ্ছে স্বগতোক্তি যেন। তখুনি স্বার্থপরতা মুখর হয়ে ওঠে, আত্মম্ভরিতা মাথা চাড়া দেয়, নয়তো নিখাদ মহানুভবতা আত্মপ্রকাশ করে। শেষ অবধি, ওই ঘটনার পর, আমার অন্যান্য কাজের ব্যাপারেও, আমি অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা হয়ে উঠলাম, অচিন্তনীয়রূপে। খোলাখুলি বলে বেড়াতে লাগলাম আমার স্বরূপ কি, কি আমার জীবনযাপনের প্রণালী। রেখে ঢেকে আর না থাকতে পেরে, দেখলাম আমার ব্যক্তিগত জীবনধারায় আমি অনেক বেশী মর্যাদা পেলাম—ওইভাবে আচরণ করা সত্ত্বেও, এবং তারই কল্যাণে—আমার পেশাদার জীবনের ন্যায়পরায়ণতার, নির্দোষীতার আড়ম্বরের চেয়ে অন্তত বেশী। অন্তত, আর সবার সাথে সমানতালে চলতে চলতে আমি আর নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজেকে ওয়াকিবহাল না করে পারলাম না। সুখের মুহূর্তে কারো পক্ষেই ভণ্ডামির মুখোস বজায় রাখা সম্ভব নয়—এ কথাটা কোথাও পড়েছি, নাকি নিজেরই কপোলপ্রসূত, বলুন তো সুহৃদ দেশোয়ালি ভাই?

একটি নারীর থেকে নিজেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করে নিতে যে বেগটা পেলাম আমি—যে বেগ পাবার সাথে সাথে জড়িয়ে পড়লাম আরো নানান ফ্যাসাদের পাকে—সেই বেগটা কেন পেলাম, খতিয়ে দেখতে বসে আমার কোমল অন্তরকেই দোষী সাব্যস্ত করলাম না। কারণ আমার অন্তর তো তখন কোমল দেখি নি, যখন কামনার উচ্চৈঃশ্রবার পথ চেয়ে বৃথাই বসে থাকতে থাকতে আমার এক প্রণয়িনী বিফল মনোরথ হয়ে আমায় ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল। বরং আমিই আগ বাড়িয়ে সায় দিয়েছিলাম তার প্রস্তাবে, মুখর হয়ে উঠেছিলাম প্রিয় ভাবণে। স্নেহ, অন্তরের দুর্বলতা এসব তার মাঝে জাগিয়ে তুলেছিলাম আমি, কিন্তু নিজের মাঝে পাই নি তার অনুভূতি,—কেবল একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম সেই প্রণয়িনীর প্রত্যাখ্যান পেয়ে, একজন স্নেহাস্পদাকে হারাতে হবে ভেবে একটু

বিস্মিত হয়েছিলাম। কখনো কখঁনো মনে হচ্ছিল, যেন বেশ ব্যথাও লাগছে। কিন্তু সেই যে সে বিদ্রোহ করে চলে গেল, তাকে ভুলে গেলাম আমি অনায়াসে, যেমন অনায়াসে আমি তাকে ভুলে যেতে পারলাম যখন সে নিজে থেকেই চাইল আমাকে ফিরে পেতে। না, ভালবাসা কিংবা মহানুভবতায় আমি মোটেই বিচলিত হতাম না যখন আমায় কেউ ছেড়ে যেতে চাইত; আমার বাসনা জাগত প্রেমাস্পদ হতে, আদায় করে নিতে আমার প্রাপ্য যা কিছু। যে-ক্ষণে আমার আমি প্রেমাস্পদ হয়ে উঠতাম, ভুলে যেতাম আমার সঙ্গিনীকে, আমি আবার ভাস্বর হয়ে উঠতাম, ফিরে পেতাম আমার পূর্ব বৈশিষ্ট্য, হয়ে উঠতাম ঈপ্সিত।

আরো বলা যেতে পারে, যে ক্ষণে আমি ফিরে পেতাম হৃত বাৎসল্যের স্বাদ, উপলব্ধি করতাম তার গুরুত্ব। বিরক্ত যখন হয়ে উঠতাম, নিজের মনেই বলতাম, এর একমাত্র সমাধান হলো আমার ঈপ্সিতাকে হত্যা করা। সে যদি মরত তবে চিরতরে আমাদের সম্পর্কটা থাকত অটুট কিন্তু থাকত না সেই সম্পর্কের মাঝে কোন বাধ্যবাধকতা। কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ লোকের তো আর মৃত্যু কামনা করা চলে না, কিংবা চূড়ান্ত দৃষ্টিতে, গোটা পৃথিবীকে তো জনশূন্য করা চলে না—অন্যথায় যে স্বাধীনতা উপভোগ করা অসম্ভব, তারই আস্বাদনের খাতিরে! আমার স্পর্শকাতর স্বভাব এ বিধি মেনে নিতে রাজী হয় নি, আর রাজী হয় নি আমার মানব প্রেম।

এসব হাঙ্গামার মাঝে একমাত্র যে অনুভূতি আমার আসত—তা ছিল কৃতজ্ঞতা, যখন সবকিছুই নির্বিঘ্নে চলতে থাকত আর আমার হাতে পেতাম যথেচ্ছ গতায়াতের স্বাধীনতা ও নিরুদ্বেগ—তখন, একজনের বিছানা ছেড়ে অন্যজনের শয্যাগ্রহণের কালে, আমার চেয়ে হৃদয়বান, স্ফূর্তিবাজ পুরুষ কোথাও মেলা ভার হতো, যেন একটি রমণীর সাথে যে ঋণের সম্পর্ক স্বাক্ষরিত হয়েছে আমার, তামাম দুনিয়ার রমণীই সেই একই ঋণ-সূত্রে আমার কাছে বাঁধা পড়ে

গিয়েছে। যাই হোক, আপাতদৃষ্টিতে আমার হাবভাব যতই দুর্বোধ্য লাগুক না, ফল পেতাম আমি স্বচ্ছ, সরল : যাকে খুশি আমার স্নেহপ্রবণতায় আমি অভিষিক্ত করে দিতে পারতাম যে কোন মুহূর্তে। নিজের অনুমোদনক্রমে আমি সুখী হতে পারতাম তখনই, যখন তাবৎ বসুন্ধরার অধিবাসী, কিংবা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতমের অন্তর আমার প্রতি আকৃষ্ট হতো, কিন্তু থাকত অনাসক্ত, আপন আপন পৃথক সত্তা সম্বন্ধে তারা থাকত না সচেতন, আর যে কোন মুহূর্তে তাদের ডাকলেই সে ডাকে সাড়া দিতে রাজী থাকত, অর্থাৎ নির্জীবের মত পড়ে থাকত যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাদের প্রতি করুণা করে তাদের সক্রিয় করে তুলতাম। মোদ্দা কথা, আমার সুখী জীবন যাপন করতে চাওয়া মানে আমার আশে-পাশের যারা, তাদের একেবারেই জীবন না যাপন করা। যখন খুশি, চকিতে আমিই করব তাদের ক্ষণতরে উজ্জীবিত।

একথা বলতে বিন্দুমাত্র আত্মপ্রসাদ আমি পাচ্ছি না, বিশ্বাস করুন। যে আমলে আমি সবকিছুই চাইতাম কোনকিছুর নির্ধারিত মূল্য না দিয়েই, নিজের কাজে নিয়োগ করতাম অতগুলো লোককে, তাদের প্রায় রেফ্রিজারেটরেই তুলে রেখে দিতাম কবে কাকে তলব করব তার ঠিক না থাকার দরুন, তখনকার কথা ভেবে মনটা যে অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় কি নামে তাকে অভিহিত করব জানি না। বোধহয় লজ্জা—তাই না? বলুন না, সুহৃদ দেশোয়ালি ভাই, লজ্জাও সুযোগমত দংশন করে না? করে? ঠিক, তবে লজ্জা কিংবা মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ওই জাতীয় বাজে অনুভূতিই হবে। যেদিন আমার স্মৃতির কোঠায় তুলে রাখা সেই আসল ঘটনাটা ঘটল, তারপর কোনদিনই এই অনুভূতির কবল থেকে আমি রেহাই পাইনি, তার উল্লেখ আগেই করেছি, না করে পারি নি, হাজার চেষ্টা করেও পারি নি তাকে ভুলতে।

বাঃ, বৃষ্টিটা থেমে গেল। দোহাই আপনার, ফেরবার পথটুকু

আমার সাথেই চলুন। আশ্চর্যরকম ক্লান্তি বোধ করছি আমি, এত যে কথা বলেছি তার দরুন নয়, যা এখনো বলি নি, সেই কথা বলতে হবে, ভাবতেই ক্লান্তি লাগছে। নাঃ, অল্প কথাতেই বুঝিয়ে বলতে পারব আমার প্রধান আবিষ্কারের কথাটা। ফেনিয়ে বলে লাভটাই বা কি, বলুন? যে প্রতিমূর্তি চিরটা কাল নিরাবরণই থাকবে, তার কাছে আকছার ফেনিয়ে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ব্যাপারটা বলি। নভেম্বরের সেই রাতে,—যে সন্ধ্যায় আমার পেছনে শুনি সেই হাসি, তার বছর দুই তিন আগের ঘটনা,—পঁ রোয়াইয়ালের পথ ধরে, বাঁদিকের তীর বরাবর আমি বাড়ি ফিরছিলাম। রাত প্রায় একটা হবে। সামান্য ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছিল। পথে অল্প যে কয়জন পথিক ছিল, সব ছিটিয়ে পড়েছিল। এক প্রণয়িনীর কাছ থেকে আসছিলাম—ততক্ষণে সে-ও বোধহয় গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল। চলতে ভারি ভাল লাগছিল, একটু যেন তন্দ্রাচ্ছন্নভাবেই চলছিলাম, সারা গায়ে আমার যেন বয়ে চলছিল বর্ষণমুখর ওই ধারার মতই শীতল স্নিগ্ধ রক্ত। ব্রীজের ওপর দিয়ে কে একজন যেন ঝুঁকে দেখছিল তলায় বয়ে যাওয়া নদীটাকে; আমি তার পেছন দিয়ে চলে গেলাম। কাছ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম, কালো পোশাক পরা রোগামত একটি মেয়ে। কালো চুল আর কোটের কলারের মাঝামাঝি তার শীতল নগ্ন ঘাড়ের খানিকটা দেখে মনটায় আমার ঝিলিক খেলে গেল। কিন্তু অল্প একটু ইতস্তত করে আমি নিজের পথেই পা বাড়ালাম। ব্রীজের শেষে, আমি স্যাঁ মিশেল্-এর পথ ধরলাম, আমার বাড়ির পথ। প্রায় পঞ্চাশ গজ যাবার পর, শুনলাম একটা আওয়াজ—অত দূরত্ব সত্ত্বেও যা রাতদুপুরের স্তব্ধতা ভেঙে অত্যন্ত জোরে এসে পৌঁছল আমার কানে—কারো জলে ঝাঁপ দেবার আওয়াজ। চকিতে একটু দাঁড়িয়ে পড়লাম, কিন্তু পেছন দিকে ঘুরলাম না। প্রায় তক্ষুণি এক চিৎকার শুনলাম বার কয়েক, সেটা স্রোতের মুখে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। তারপর, সব চুপচাপ।

রাতটা যেন সেখানেই থমকে দাঁড়াল, অফুরন্ত মনে হতে লাগল তারপরের দীর্ঘ স্তব্ধতা। দৌড়ে পালাতে চাইলাম, কিন্তু এক চুলও নড়তে পারলাম না। থরথর করে কাঁপতে লাগলাম আমি, বোধহয় ঠাণ্ডায় আর উত্তেজনায়। মনকে বোঝালাম, তাড়াতাড়ি যা করবার করে ফেলতে, আর অনুভব করলাম দুর্দমনীয় এক দৌর্বল্য আমায় গ্রাস করে ফেলতে লাগল। তখন যে কি ভাবছিলাম, এখন আর মনে নেই। 'এত দেরি হয়ে গেল·· বড় দূরে চলে গেল ···' জাতীয় কিছু হবে। নিস্পন্দ, নিঃঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলাম আমি। তারপর, নীরবে আস্তে আস্তে নিজের পথ ধরলাম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। এ কথা কাউকে আমি বললাম না।

এই তো, এসে গেছি; এই আমার বাড়ি, আমার ডেরা! কাল? বেশ তো, আপনি যদি চান। ভাবছি, আপনাকে কাল মার্কেনের দ্বীপে নিয়ে যাব, সুইডার্‌সী দেখাতে। 'মেক্সিকো সিটি'র সরাইয়ে তবে কাল এগারোটায় দেখা হবে, কেমন? কি বললেন? সেই মেয়েটা? একদম জানি না। সত্যি বলছি, আমি কিছুই জানি না। পরদিন, পরপর বহুদিন, আমি আর কাগজই পড়ি নি।

## চার

যেন পুতুলের গ্রাম, তাই না? আজব সব চীজের এখানে অভাব নেই। কিন্তু, বন্ধুবরেষু, আপনাকে আমি এই দ্বীপে আজবচীজ দেখাব বলে আনি নি। সে তো যে কেউই দেখাতে পারত—চাষীদের মাথার পোশাক, কাঠের জুতো, কারুকার্য শোভিত বাড়ি, ঘর, সুগন্ধি তামাক সেবনরত জেলে, নতুন পালিশের গন্ধ! কিন্তু আমি হচ্ছি সেই দুর্লভ ব্যক্তিদের অন্যতম যারা আপনাকে এ-অঞ্চলের আসল তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতে সক্ষম।

আমরা বাঁধটার কাছে এসে পড়েছি। এই বাঁধ বরাবর যতদূর সম্ভব আমাদের চলে যেতে হবে মনোহর এই বাড়িগুলো ছাড়িয়ে। আস্থন, বসা যাক। তারপর? কেমন দেখছেন? কি চমৎকার নেগেটিভ দৃশ্য, না? বাঁ দিকে দেখছেন একরাশ ছাই, যেটাকে এরা বালিয়াড়ি বলে, তাব বাঁ পাশেই ছাইরঙা বাঁধ, আর আমাদের পায়ের তলায় এই বিবর্ণ বেলাভূমি, সামনে সমুদ্রটা যেন ক্ষারগোলা জল, যার নিষ্প্রভ ছবি বিরাট আকাশের বুকে। থৈ থৈ করছে যেন রসাতল! সবকিছুই একমেটে, কোথাও একটু চড়াই নেই! বিবর্ণতার মেলা বসেছে, জীবন এখানে মৃত। এই যেন মহাবিলুপ্তির শেষ, চিরন্তন শূন্যতার দৃশ্যমান চেহারা। কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই. সবচেয়ে বড় কথা, কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই। আপনি আর আমি খালি বসে আছি জনমানবহীন এই গ্রহের বুকে! আকাশ বেঁচে আছে? ঠিক বলেছেন, বন্ধুবরেষু। কেমন পুরু হতে হতে অবতল হয়ে যায়, হঠাৎ খুলে দেয় এক দমক হাওয়া, আবার বন্ধ হয়ে যায় মেঘের দুয়ার। ওই তো, পায়রা! দেখেন নি লক্ষ্য করে? হল্যাণ্ডের আকাশ যে লক্ষ লক্ষ পায়রায় ছেয়ে আছে; এত উঁচুতে তারা উঠে যায় যে চট্ করে ঠাহর করা কঠিন; পাখা পত্‌পত্ করে উড়ে চলে তারা সবাই একতালে, মহাশূন্য ভরে যায় তাদের গাঢ় ছাই ছাই পালকে, হাওয়ায় সর্বত্র ছড়িয়ে যায় সেই পালক। বারোমাসই ওখানে ওদের বাসা। পৃথিবীকে ঘিরে গোল-গোল হয়ে ঘুরেই চলে ওরা, নিচের পানে চেয়ে দেখে, নেমে আসতে চায়। কিন্তু চারদিকে শুধু সমুদ্র আর ক্যানাল, ছাতে ছাতে দোকানের বিজ্ঞাপন, একটাও মাথা মেলা ভার যার ওপর নেমে দু-দণ্ড সুস্থির হয়ে ওরা বসতে পারে।

যা বললাম, বুঝতে পারছেন না? স্বীকার করছি, ভারি ক্লান্ত আমি; কথার খেই হারিয়ে ফেলছি; বাচনের সেই বুদ্ধির দীপ্তি

আমি হারিয়ে ফেলেছি, যে দীপ্তি একদিন আমার বন্ধুমহলে তুলত সশ্রদ্ধ বিস্ময়। 'বন্ধুমহল' বললাম, ওটা একটা কথার কথা। বন্ধু আর আমার নেই। আজ নিখিল মানবতা নিয়েই আমার কারবার। আর নিখিল মানবতার মাঝে আপনিই এক নম্বর। সব চেয়ে কাছে যিনি, তিনিই সর্বদা এক নম্বর। কি করে বুঝলাম আমার বন্ধু নেই? ভারি সোজা কথা, যেদিন, আমার বন্ধুদের জব্দ করব ভেবে আত্মহত্যা করবার সিদ্ধান্ত নিলাম, আংশিকভাবে ওদের শায়েস্তা করব ভেবে। কিন্তু শায়েস্তাটা করব কাকে? বিস্মিত হবে অনেকেই, কিন্তু শায়েস্তা হবে কে? স্পষ্ট বুঝলাম, বন্ধু আমার কেউই নেই। আর, থাকলেও আমার কি আসত যেত? যদি ধরুন, আত্মহত্যা করার পর সত্যিই আমি দেখতে পেতাম ওদের মনের প্রতিক্রিয়া, তবে খেলাটা একহাত দেখে নিতে পারতাম। কিন্তু মাটির রং অন্ধকার, বন্ধুবরেষু, কফিন অত্যন্ত পুরু, শবাচ্ছাদনী ভেদ করে কোনকিছু দেখা অসম্ভব। আত্মার দৃষ্টি—ধরুন গিয়ে—আত্মা যদি সত্যিই থাকত আর তার যদি দৃষ্টি থাকত! কিন্তু কেউ কি হলপ করে সে কথা বলতে পারে? তা নইলে দিব্যি একটা সমাধান তো হাতের কাছেই ছিল; নিজের কথা অন্তত মানুষ গাম্ভীর্যের সাথেই বিবেচনা করে দেখতে পেত। যতই যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চান, মানুষ কখনোই তা বুঝতে চাইবে না, চাইবে না আপনার আন্তরিকতাকে, আপনার দুঃখের গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে—যতক্ষণ না আপনি মরছেন। যতদিন বেঁচে আছেন, আপনাকে কেউ কল্কে দেবে কিনা সন্দেহ। কেবলমাত্র ওদের সংশয়বাদেরই ভাগীদার হবার স্বাধীনতা ততদিন আপনার থাকবে। কিন্তু মৃত্যুর পরেও সবকিছু দেখা যাবে—এ অভয় যদি কেউ দেয়, তবে এ সত্য প্রমাণিত করে দেওয়াটা ভারি লোভনীয় ব্যাপার হবে। অন্যথায় নিজেকে খামকা খুন করলেন, কিন্তু তাদের আদৌ মাথাব্যথা রইল না বিশ্বাস করা না করা সম্বন্ধে, সে দারুণ অস্বস্তিকর। আপনিই

যদি দেখতে পেলেন না তাদের বিস্ময়, তাদের অনুতাপ (কিংবা বড়জোর পলায়ন), প্রত্যক্ষ করতে পেলেন না আপনার শ্রাদ্ধ—তবে আর মজা কোথায়? কারো সংশয়েব পাত্র না হতে গেলে চাই জীবন যাপন না-করা, এই হলো মোদ্দা কথা।

তার চেয়ে, এই ভাল নয় কি? অন্যের উপেক্ষা আমাদের প্রাণে বড় করেই বাজে। অত্যন্ত স্মার্ট এক পাণিপ্রার্থীর সাথে কন্যার বিয়ে দিতে এক বাবা যখন নারাজ হন, মেয়ে বাবাকে শাসায়, 'এর ফল তোমায় ভুগতে হবে।' তারপর মেয়ে আত্মহত্যা করে বসল। কিন্তু বাপকে কোন ফলই ভুগতে হলো না। নকল মাছির টোপ দিয়ে মাছ ধরাটা বাপের ভারি প্রিয় ছিল; তিনটে রোববার যেতে না যেতেই বাপ নদীর ধারে গিয়ে যথারীতি বসল—অবশ্য বলল, মেয়ের শোক ভুলতে। ঠিক কথাই; বাপ সব শোকই ভুলে গেল। সত্যি বলতে কি, না-ভোলাটাই আশ্চর্যজনক। যদি আপনি আপনার বউকে শাস্তি দেবেন ভেবে আত্মহত্যা করতে যান, বউয়ের তাতে স্বাধীনতা বাড়বে বই কমবে না। তার চেয়ে দুঃখকর আর কি আছে বলুন? বড়জোর, লোকে কানাঘুষো করবে আপনার অমন সিদ্ধান্তের কারণ সম্বন্ধে। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, লোকে বলছেঃ 'বেচারা, আত্মহত্যা করল ·····সইতে না পেরে,' ইত্যাদি। হায়, বন্ধুবরেষু, মানুষের কল্পনাশক্তি কত কম! তাদের ধারণা আত্মহত্যা করে লোকে সর্বদাই একটি কোন কারণ-পরবশ। কিন্তু দু-টি কারণ-পরবশও যে আত্মহত্যা করা সম্ভব, তা কেউ জানে না। কখনো সে সম্ভাবনা কারো মাথায় জাগেই না। তবে, আর কেন খামকা জেনে শুনে আত্মহত্যা করা? লোকেই যদি না বুঝল আপনার মনের কথা? শহীদদের, বুঝলেন বন্ধু, তিনটির একটি পথ বেছে নিতে হবে; হয় লোকে তাঁদের ভুলে যাবে, নয় তাঁদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে, নয়তো তাঁদের নাম ভাঙিয়ে খাবে। তাঁদের বোঝবার চেষ্টা—নৈব নৈবচ!

আঁধারে হাৎড়ে বেড়াই কেন অনর্থক ? আদত কথাই বলি, জীবনকে আমি ভালবাসি—এই আমার সত্যকার দুর্বলতা। জীবনের প্রতি আমি এত অনুরক্ত যে জীবনাতীত কোনকিছুর কথা আমি কস্মিনকালেও কল্পনা করতে পারি না। এই দীনতার মাঝে যেন অনুন্নত শ্রেণীর এক মনোভাব পরিস্ফুট, তাই না ? আভিজাত্যের মাঝে দেখবেন কেমন যেন স্বাতন্ত্র্যের ভাব রয়েছে জীবনের সাথেই বলুন পরিবেশের সাথেই বলুন। প্রয়োজন হলে মরতে তার আপত্তি থাকে না ; ভাঙে, তবু মচকায় না। কিন্তু আমায় মচকাতেই হয়, কারণ আমি যে প্রতি মুহূর্তে নিজেকেই খালি ভালবাসি। ধরুন, এত দুর্ঘটনার ইতিবৃত্ত আপনাকে যে বললাম, তারপর আমার মনে প্রতিক্রিয়া কি হলো ? নিজের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা ? মোটেই না, আমি বিরূপ হয়ে উঠলাম আর-দশজনের ওপর। এ কথা নিশ্চিত যে আমি আমার খুঁত সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম ষোল আনা, সেজন্য অনুতাপও কম করি নি। তবু সে সব খুঁত আমি ভুলে যেতাম প্রশংসনীয় একগুয়েমির সাথে। অন্যদিকে—অপরের স্খালন, ত্রুটি বিচ্যুতি আমার কাছে অক্ষমণীয় হয়ে ধরা দিত নিয়তই। এতেই আপনি বিচলিত হলেন ? বোধহয় আপনার মনে হচ্ছে, এমন মনোভাব নেহাৎ অযৌক্তিক ! কিন্তু যুক্তিযুক্ত থাকাটা তো কোনকালে আমার ঈপ্সিত ছিল না। আমার সমস্যা ছিল কি ভাবে রেহাই পাব আর, সর্বোপরি—হ্যাঁ, সর্বোপরি, কি ভাবে সর্বপ্রকার বিচারের হাত আমি এড়িয়ে যাব ! শাস্তি এড়িয়ে যাবার কথা বলছি না, কারণ নির্বিচারে শাস্তিভোগ বেশ সহনীয়। তা ছাড়া তার মাঝে থাকে 'নির্দোষ প্রতিপন্ন হতে পারত' গোছের প্রত্যাশা : লোকে একে দুর্ভাগ্য বলেই গণ্য করে। না, না, আমি চাইতাম ন্যায়ের চোখে ধুলো দিয়ে, বিচারের নিকুচি করে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতে।

কিন্তু ধাপ্পা দেওয়া অত সোজা নয়। আজকের দিন আমরা তুলনামূলক বিচার করতে আর ব্যভিচার করতে সমান পটু হয়ে

উঠেছি। প্রভেদ এই, কাঁচা হাতেরও এখন কোন ভয় নেই। কথা আপনার কাছে যদি প্রণিধানযোগ্য না ঠেকে, তবে আগস্ট মাসে কোন গ্রীষ্মকালীন হোটেলে বসে শুনুন গিয়ে আমাদের দয়ালু সহনাগরিকদের খোসগল্প; এখানে তাঁরা আসেন একঘেয়েমি কাটাতে। তাতেও যদি আপনার সংশয় না কাটে, এ যুগের মহামানবদের লেখা পড়ুন। নয়তো নিজের পরিবারের দিকেই একবার ফিরে তাকান, গোটাদুই জবর জিনিস শিখে নিতে পারবেন। বন্ধুবরেষু, আমাদেরকে বিচার করবার অধিকার কাউকে যেন না দিয়ে ফেলি, ক্ষুদ্রতম, কোন অছিলাতেই নয়। তবে আমাদের টুকরো করে ফেলে রাখবে লোকে। সিংহ নিয়ে খেলা দেখায় যারা, তাদের মতই সতর্ক থাকতে হবে আমাদের; ধরুন, খাঁচায় ঢোকবার আগে যদি 'দুর্ভাগ্যক্রমে বেচারার গাল কেটে যায় দাড়ি কামাতে গিয়ে, তবে পশুগুলোর হাতে ওর কি দুর্দশাটাই না হবে, ভেবে দেখুন! যেদিন থেকে মনে আমার সংশয় ঢুকল নিজের চমৎকারিতা সম্বন্ধে, সেদিনই আমি এই উপলব্ধির নাগাল পেয়ে গেলাম হঠাৎ। আমার কোথায় যেন সামান্য ক্ষতের সন্ধান ওরা পেয়ে গিয়েছে; পালানোর আর পথ নেই আমার। এবার আমায় সবাই গিলে খাবে।

তবু আমার সমকালীন সহকর্মীদের সাথে আমার আচরণ আপাতদৃষ্টিতে অভিন্নই ছিল, যদিও কোথায় যেন বেসুরো ঠেকছিল। বন্ধুদের মধ্যে কোন পরিবর্তনের সূত্র খুঁজে পাই নি। পূর্বের মতই আমার সান্নিধ্যে এসে এক সামঞ্জস্যের নিরাপত্তার স্বাদ পেত তারা, এ কথা তখনো শুনতাম মাঝে মাঝে। কিন্তু আমি নিজের মাঝে কেবল দেখতে লাগলাম বিশৃঙ্খলার, বৈষম্যের প্রাচুর্য। নিজেকে প্রতিপদে মনে হতো অপরাধী, মনে হতো এই বুঝি জনসাধারণ ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর দারুণ আক্রোশে। আমার সঙ্গীরা আর আমার চোখে বাঞ্ছিত শ্রদ্ধাস্পদ সহচর রইল না; আমাকে কেন্দ্র করে

যে বৃত্তটি গড়ে উঠেছিল, মনে হলো, ধীরে ধীরে তা ভেঙে গিয়ে রূপ নিচ্ছে একটা সরলরেখার, যেন বিচারকের বেঞ্চি পাতা হচ্ছে। যে মুহূর্তে আমি বুঝলাম যে আমার মাঝে বিচার্য কোন অপরাধ আত্মগোপন করে আছে, অমনি আমার স্পষ্ট মনে হলো, আমার অনুগামীরা সকলেই তলায় তলায় নিপুণ বিচারক। তারা তখনো আমার সঙ্গে ছায়ার মত থাকলেও, তাদের মুখ চোখ ফেটে পড়ছে হাসির দমকে। না, আমার মনে হলো, প্রত্যেকেই যেন আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে এক অদম্য হাসি সামলাতে সামলাতে। সে সময় আমার এ কথাও মনে হচ্ছিল, লোকে যেন আমায় ল্যাং মারবার সুযোগ খুঁজছে। সত্যি বলতে কি, বার দুই তিন হুমড়ি খেয়ে আমি পড়েও গেলাম প্রকাশ্য দিবালোকে। এমন কি, একদিন রীতিমত গড়াগড়ি খেলাম মেঝের 'ওপর পড়ে। আমার মনের দেকার্ত-সুলভ ফরাসী চেতনা অবিলম্বেই আত্মসম্বরণ করে নিল—এ সবই দৈবাৎ ঘটেছে বলে মনকে চোখ ঠেরে। তবু আমার মন সন্দিহান হয়েই রইল।

একবার যখন আমি সচেতন হয়ে উঠলাম, আমার বুঝে নিতে দেরি হলো না যে আমার শত্রুর অভাব নেই। আমার কর্মক্ষেত্রেও যেমন, তেমনি দৈনন্দিন জীবনেও। তাদের অনেকেই আমার অনুগৃহীত। আর, তাদের অনেককেই অনুগৃহীত করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু এসব আবিষ্কার করেও তেমন কোন অনুশোচনা আমার হলো না। কিন্তু বড় বেশী করে আমার বাজল যেদিন দেখলাম আমার স্বল্প পরিচিত বা সম্পূর্ণ অপরিচিত যারা, তাদের মধ্যেও আমার শত্রুর অভাব নেই। আমার মনের সহজাত বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমি ভাবতাম যে যারা আমায় চেনে না, আমার সাথে পরিচিত হয়ে তারা কৃতার্থই হবে। কোথায়! যারা আমায় দূর থেকে জানত, তাদের মাঝেই দেখলাম প্রচণ্ড বৈরীভাব। আমি তাদের চিনতামও না। নিঃসন্দেহ, তাদের জানতে দেরি ছিল না যে

আমার জীবন যাত্রা ছিল অত্যন্ত বড় বহরের, আর সুখের স্রোতেই গা ভাসিয়ে দিতে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম ; অমার্জনীয় সে অপরাধ। অপরকে সুখী দেখলে অতি বড় নিরেট গাধারও মাথা বিগড়ে যেতে পারে। আর আমার জীবন তো টইটুম্বুর করছিল ; সময়াভাবে কত প্রার্থীকে নিরাশ করতাম যে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেই প্রত্যাখ্যানের কথাও আমার ভুলতে দেরি হতো না। কিন্তু সেই প্রার্থীদের জীবন তো আর টইটুম্বুর করত না, কাজেই আমার প্রত্যাখ্যানের গ্লানি তারা মনে রাখত।

সেজন্যেই, উদাহরণ স্বরূপ, আপনাকে বলি, শেষের দিকে নারীসঙ্গই আমার কাল হল। তাদের সান্নিধ্যে আমার যতটা সময় কাটত, ততটা সময় দিতে আমি অপারগ ছিলাম পুরুষ-সান্নিধ্যে ; এর জন্য অনেকেই আমার বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করত। কিন্তু উপায় কি ? আপনার সাফল্য, সুখ সবই ন্যায্য বলে গৃহীত হবে যতক্ষণ আর দশজনের সাথে আপনি তা ভাগ করে নিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু সুখী হতে গেলে কি আর দশজনের কথা ভাবলে চলে ? কাজেই পালানোর পথ নেই। হয় সুখী হয়ে বিরাগভাজন হোন, নয়তো, অকৃপণ সহৃদয়তার বালাই নিয়ে সর্বস্বান্ত হোন। কিন্তু আমার ভাগ্যে অন্যায় প্রবলতর ঠেকল কারণ অতীত সাফল্যের জের টেনে আমায় অভিযুক্ত করা হলো। বহুকাল আমার মনে ভুল ধারণা ছিল যে সবাই আমার সুহৃদ, কিন্তু আমি দেখলাম যে হাসিমুখে আমি এতদিন অন্যমনস্ক হয়ে বাস করে এসেছি দ্বেষ, শ্লেষ আর তুমুল বাক্যবর্ষণের মাঝে। যেদিন আমি সজাগ হলাম, আমার হুঁস ফিরল, দেখলাম চারিধার থেকে যুগপৎ আঘাত এসে আমায় হতবুদ্ধি করে তুলল। তামাম বিশ্বজগৎ আমার দিকে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

এই জিনিস কোন মানুষের পক্ষেই সহ্য করা ( যারা সত্যিই বেঁচে নেই—অর্থাৎ পণ্ডিতেরা ছাড়া ) অসম্ভব। মানুষের একমাত্র দম্ভ

বোধহয় ঘৃণা করতে পারা। লোকে অপরকে বিচার করতে চায় পান থেকে চুন খসতে না খসতেই, সে কেবল নিজে রেহাই পাবার আশায়। এর বেশী কি আর চাই, বলুন? স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের মনে যে ভাবটি জাগে, যেন তার স্বভাবেরই স্বরূপ এটা, তা হলো নিজের নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করা। মনে পড়ে, বুশেন্‌ভাল্‌দের সেই ফরাসী ভদ্রলোকের কথা, যিনি গোঁ ধরে বসলেন, প্রবেশ পথে এক কেরাণীকে দেখে ( কেরাণী নিজেই একজন কয়েদী ) যে তার কাছে তাঁর অভিযোগ তিনি খুলে বলবেন। অভিযোগ? কেরাণী আর তার সহকর্মীরা হেসে উঠল, 'সে গুড়ে বালি। এখানে কেউ অভিযোগ উত্থাপন করতে আসে না।' 'আহা, বুঝছেন না,' ফরাসী ভদ্রলোক বললেন, 'আমার কথাই আলাদা যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ!'

আমাদের সবার কথাই, বুঝলেন, আলাদা। আমাদের সবারই অভিযোগ—অন্যকিছুর বিরুদ্ধে। প্রাণপণ চেষ্টা আমাদের, কি করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করব; সেজন্য যদি তামাম মানবতাকে, খোদ ভগবানকে দায়ী করতে হয়, তাও সই। যে উদ্যম নিয়ে লোক বুদ্ধিদীপ্ত বা দয়ালু হয়ে উঠেছে, সে উদ্যম সম্বন্ধে তাকে প্রশংসা করুন, সে বিন্দুমাত্র উৎফুল্ল হবে না; কিন্তু তার স্বভাবজাত দাক্ষিণ্যের প্রশংসা করা মাত্র উল্লাসে ডগমগ করে উঠবে তার মুখ। আবার, কোন অপরাধীকে গিয়ে যদি বলেন, তার প্রকৃতি বা চরিত্রের দোষে সে অপরাধটা করে নি, সবই বিধি বাম হয়েছেন বলেই ঘটেছে, দেখবেন, সর্বান্তঃকরণে সে কেমন কৃতজ্ঞ হয়ে উঠবে আপনার কাছে। তার পক্ষের উকিলের ভাষণ যতক্ষণ চলবে, তার মাঝে ঠিক এইটুকু সময়ই সে বেছে নেবে কাঁদবার প্রশস্ততম মুহূর্ত রূপে। কিন্তু দেখুন, আজন্ম সৎ কিংবা বুদ্ধিমান হবার মধ্যে আর বাহাদুরীটা কই? যেমন ধরুন, প্রকৃতির দোষেই অপরাধী হওয়ার মধ্যে বেশী ঝক্কি আছে বলেও তো মনে হয় না, ঘটনাচক্রে পড়ে অপরাধী হবার চেয়ে।

কিন্তু তারা চায় করুণা, অর্থাৎ দায়িত্ব-মুক্তি, আর তারই অজুহাতে তারা প্রকৃতির দোষের দোহাই দিয়ে কিংবা ঘটনাধারার ওপর দোষ আরোপ করতে কি নির্লজ্জ প্রয়াসটাই না করে, যত অসঙ্গতই হোক না কেন সে প্রচেষ্টা। আসলে তারা চায় নির্দোষ প্রমাণিত হতে, তাদের ধর্মপরায়ণতা যে জন্মাবধিই বলবৎ সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না উঠতে দিতে, তাদের দুষ্কর্ম সবই যে দৈবাৎ কু-গ্রহের ফেরে ঘটেছে, সাময়িক—এইটুকু সাব্যস্ত হলেই তারা খুশি। বলি নি, এই হলো বিচার এড়িয়ে যাবার পন্থা। কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া এমনই দুরূহ ব্যাপার, নিজের স্বভাবকে যুগপৎ প্রশংসনীয় আবার ক্ষমণীয় প্রতিপন্ন করা এতই চাতুরীসাপেক্ষ যে সবাই একজোটে চায় ধনী হতে। কেন? নিজেকে এ-প্রশ্ন করে দেখেছেন? স্রেফ, ক্ষমতার খাতিরে। বিশেষ করে টাকা থাকলে হাতে-নাতে আপনাকে কেউ অভিযুক্ত করতে যাবে না বোঁ করে, জনসাধারণের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সন্তর্পণে আপনাকে গিয়ে তুলে দেবে ক্রোমিয়াম-মোড়া মোটরগাড়ির আশ্রয়ে, বিরাট নিরাপদ লন্ থাকবে আপনার চারিপাশে, থাকবে পুল্‌ম্যান গাড়ি, উৎকৃষ্ট কেবিন। কিন্তু, বন্ধুবরেষু ধন ঠিক রেহাই দেয় না, দণ্ড স্থগিত রাখতে সাহায্য করে। আর সেইটুকু কি কম কাম্য?

বিশেষত. আপনাদের বন্ধুদের আদৌ বিশ্বাস করবেন না, অন্তত যখন তারা চায় আপনার আন্তরিকতা। তখন তাদের মনে এই আশাই থাকে যে তাদের আত্মপ্রসাদের ইন্ধন আপনি জুগিয়ে যাবেন অক্লান্ত উৎসাহে। আন্তরিকতা যে কি করে বন্ধুত্বের পাথেয় হতে পারে, আমি ভেবে পাই না। সত্যানুসন্ধিৎসা হলো এক অদম্য রিপু যার হাতে কারো রেহাই নেই, যাকে কেউ ঠেকাতে পারে না। প্রায় পাপের পর্যায়েই তা পড়ে, বেশ আরামপ্রদও, কিংবা বলতে পারেন, স্বার্থপরতাও। কাজেই, এমন সমস্যার যদি সম্মুখীন হয়ে থাকেন, আর দ্বিধা করবেন না, কথা দিন, যথাসাধ্য সত্যও বলবেন, মিথ্যাও।

তাতে তাদের মনের গোপন কামনা অনেকগুলোই তৃপ্তি পাবে, দুটি উপায়ে আপনার স্নেহের স্বাদ তারা উপভোগ করবে।

কথাটা এতদূর সত্য যে নিজেদের চেয়ে ভাল যারা, তাদের কথায়ও বিশ্বাস করতে আমরা বেশীর ভাগ নারাজ। উল্টে, তাদের সঙ্গ পরিহার করেই চলি আমরা। আবার, আমাদের সমান মেকদারের লোকের কাছেই সচরাচর আমরা ব্যক্ত করে বসি মনের কথা, তারা আমাদের দুর্বলতার অংশীদার হয়ে ওঠে। ফলে আমরা উন্নতি করতে পারি না, ভাল হতে পারি না, কারণ আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হবার আগে আমাদের বেঁধে ফেলা চাই-ই। আমরা খালি চাই অনুকম্পা, চাই যে পথ বেছে নিয়েছি—সে পথে উৎসাহ। মোদ্দা কথা, একই সঙ্গে আমরা চাই নিরপরাধ প্রমাণিত হতে, আবার নিজেদের কলুষ মুক্ত করবার চেষ্টা করতেও চাই না। যথেষ্ট পরিমাণ সংশয়বাদীও নই, যথেষ্ট পরিমাণ ধর্মভীরুও নই। যে উদ্দাম শক্তি থাকলে পাপের পথ বেছে নেওয়া যায়, তাও আমাদের নেই যেমন, তেমনি আমাদের নেই ধর্মপথে চলবারও শক্তি। দান্তের নাম শুনেছেন? সত্যি? তবে তো আমার রসাতলে যাওয়া অবধারিত! দেবতা আর দানবের দ্বন্দ্বে দান্তে যে নিরপেক্ষ দেবদূতদের কথা বলেছেন, তার সাথে আপনি তাহলে একমত। তাদের স্থান দিয়েছেন তিনি লিম্বো-তে, নরকের একটি বৈঠকখানায়। আমাদের স্থানও সেই বৈঠকখানায়, বন্ধুবর।

ধৈর্য? হয়তো আপনি ঠিকই বললেন। শেষ দিনের বিচার অবধি সবুর করতে পারাই হয়তো ভাল। কিন্তু, দেখছেন না, আমাদের হাতে সময় নেই? আমাদের এত তাড়া যে আমি নিজেই নিজেকে বানিয়ে বসলাম অনুতপ্ত বিচারক। প্রথম প্রথম অবশ্য আমার আবিষ্কারের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হলো, নিজেকে স্থাপিত করলাম আমার সমকালীনদের উপহাস বাণের সম্মুখে। সেই যে সন্ধ্যায় আমার ডাক এল—সত্যিই যেন একটা ডাক শুনেছিলাম

আমি—সাড়া আমায় দিতেই হলো, অন্তত সাড়া দেবার জন্য আকুল হয়ে উঠলাম। বড় সোজা ব্যাপার নয়। বেশ কিছুকাল আমি ছটফট করে কাটালাম। শুরুতেই আমার বুঝতে সময় লাগল—ওই যে নিরবচ্ছিন্ন অট্টহাসি, তা যেন আমায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাইছে যে আমি বিশেষ সহজ মানুষ নই। হাসবেন না, দোহাই। যতটা মূলগত মনে হচ্ছে, এ সত্যটা তত্টা নয়। যাকে আমরা মূলগত সত্য বলি তা হলো স্রেফ যে সত্যটি আমরা আর সবকিছুর শেষে আবিষ্কার করে বসি।

তা যাই হোক, দীর্ঘকাল নিজের সম্বন্ধে গবেষণা করে আমি উদ্ধার করলাম মানব সত্তার ভিত্তিগত দ্বিচারিণী প্রকৃতি। তারপর, স্মৃতির গহনে হাতড়াতে হাতড়াতে উপলব্ধি করলাম যে বিনয়ের সাহায্যে আমি জাজ্বল্যমান হয়ে উঠতাম, নম্রতার সাহায্যে হতাম বিজয়ী, আর ধর্মভীরুতা আর সব দাবিয়ে রাখতে সাহায্য করত। ঠাণ্ডা পথে আমি লড়াই চালিয়ে যেতাম, আর জয়লাভও করতাম শেষটা, কাম্য যা কিছু পেয়ে যেতাম নিষ্কাম ভাব দেখিয়ে। যেমন ধরুন, কোনদিন আমি অনুযোগ করি নি, আমার জন্মদিনের কথা লোকে ভুলে যাবার দরুন; লোকে সসম্ভ্রম বিস্ময়ে তাকাত আমার দিকে—আমার আপনভোলা ঔদার্যের পরিচয় পেয়ে। কিন্তু আমার এই নিষ্কাম ভাবের হেতু ছিল আরো বেশী সূক্ষ্ম। চাইতাম, লোকে যাক ভুলে,—তবেই না নিজের কাছে অনুযোগ করবার মত কিছু পাব? প্রতি বছরেই, অবিস্মরণীয় সেই দিনটির বেশ কিছু দিন আগে (ও-দিনটির কথা আমার ভালভাবেই মনে থাকত) আমি সতর্ক হয়ে উঠতাম, যাতে করে, যাদের ভ্রম হবার পথ চেয়ে আমি ওৎ পেতে থাকতাম, তাদের কোন রকমে মনে না পড়ে যায় আমার জন্মদিনের কথা (এমন কি একবার আমার এক বন্ধুর ক্যালেণ্ডার অবধি পাল্টে দিতেই কি আমি ইতস্তত করেছি?)—কোনমতে নিজেকে নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব প্রমাণিত যদি করতে পারতাম মনে

মনে, তবেই আমি উপভোগ করতে সক্ষম হতাম এক পুরুষালি আত্ম-অনুকম্পার সুখ। যে তাগিদের জোরে আমার জীবনের উচ্ছৃঙ্খল রূপটা আমি ঢেকে রাখতে চাইতাম, তারই প্রসাদে আমার চেহারায় ছিল এক নির্বিকার ভাব যা লোকে সদ্গুণেরই অংশ বলে ভুল করত। আমার ঔদাসীন্যই আমায় আরো বেশী রমণীয় করে তুলত; আমার উদারমতিত্ব ছিল আমার স্বার্থপরতারই চরম প্রসার। এখানেই ও প্রসঙ্গ চাপা দিই, নয়তো আধিক্যের চাপে আমার কথার খেই হারিয়ে ফেলব। তবে যাই হোক, বাইরে থেকে আমায় দারুণ রূঢ় লাগত; তবু কোনদিন এক-পেয়ালার বা কোন নারীর প্রলোভন আমি সম্বরণ করতে পারি নি! ভারি কর্মঠ, উদ্দীপনাময় বলেই লোকে আমায় জানত, আর আমার অবাধ সাম্রাজ্য ছিল শয্যা। আমার আনুগত্যের বিজ্ঞাপন আমি প্রকাশ্যেই দিতাম, আর আমার ধারণা, হেন লোক নেই যাকে ভালবাসবার পর আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি শেষ পর্যন্ত। অবশ্য, আমার বিশ্বাসঘাতকতা আমার বিশ্বস্ততার প্রতিবন্ধক কোনদিনই হতে পারে নি; দিনের পর দিন আমি আলস্যে কাটাতে পিছ পা হই নি, কাজের গন্ধমাদন সব হটিয়ে রেখে। আর, কোনদিন আমার প্রতিবেশীকে সাহায্য করবার সুযোগ আমি হাতছাড়া করি নি; পরম সুখ পেতাম আমি এ সব কাজে। কিন্তু যতবারই মনকে এ কথা বোঝাতে বসতাম, ভাসা ভাসা সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছু সেখানে মিলত না। এক একদিন সকালে ঘুম থেকে আমি উঠতাম, নিজেকে ষোল আনা দায়ী প্রতিপন্ন করতে করতে, নিজে যে ঘৃণার অবতার, এই সিদ্ধান্ত মনে বদ্ধমূল করতে করতে। যাদের আমি যত বেশী উপকার করতাম, ঘৃণাও করতাম তাদের তত বেশী। সৌজন্যের সাথেই, ভাবপ্রবণ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে, আমি অন্ধদের মুখের সামনেই রোজ অনায়াসে থুতু ফেলতাম।

মন খুলে বলুন দেখি, এ কাজের হেতু কি থাকতে পারে? একটি হেতু থাকা সম্ভব, কিন্তু এমন জঘন্য তা যে সে কথা বলতেও আমার

বাধে। কাজ কি? বলেই ফেলিঃ কোন কালেই আমি বিশ্বাস করতে পারি নি যে মানুষের সমাজটা তেমন প্রণিধানযোগ্য একটা কিছু। কোথায় যে কি ভাবে তা প্রণিধানযোগ্য হতে পারে, অনেক ভেবেও আমি খুঁজে পাই নি। যা কিছুই দেখতাম চারপাশে—সবই যেন কৌতুকপ্রদ, নয়তো ক্লান্তিকর এক খেলা। অনেকের উদ্যম, অনেকের দৃঢ় বিশ্বাসেরই তাৎপর্য কোনদিন আমি বুঝে উঠতে পারি-নি। বরাবর আমি বিস্মিত চোখে দেখেছি সে সব, দেখেছি সন্দিগ্ধ নয়নে অর্থলোলুপতায় জীবগুলোর রকম সকম, দেখেছি সামান্য 'পদ'-চ্যুতির আক্ষেপে কি হতাশটাই না হয় তারা, নয়তো পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কি-ভাবেই না প্রাণপাত করে খেটে চলে! তার-চেয়ে বরং অনেক সহজবোধ্য ঘটনা হলো আমার বন্ধু হঠাৎ ধূমপান না কববার ব্রত নিয়ে বসল, আর স্রেফ মনের জোর দিয়ে সিদ্ধিলাভও করল। আবার একদিন সকালে বন্ধুবর খবরের কাগজ খুলে যেই দেখল, প্রথম হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে, মনের সুখে সে ছুটল তামাকের দোকানে।

কখনো কখনো জীবনটাকে গুরুতর একটা কিছু ভেবে নেবার আমি ভাণ করতাম। কিন্তু গুরুত্বের মাঝে নিহিত লঘুতা অচিরেই আমার কাছে আত্ম প্রকাশ করে ফেলত, তাই সবটাই আমার কাছে খেলা মনে হতো, খেলে যেতাম যথাসম্ভব ভালভাবেই। নিজেকে কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমান, ধর্মভীরু, সৎ নাগরিক, চকিত, সহৃপরায়ণ, দায়িত্ব-জ্ঞানপূর্ণ, উচ্চমনা—ইত্যাদি কত রকম ভূমিকায়ই না বসিয়ে দেখতাম! ···আদতে, আর না বললেও আপনার মালুম পড়ছে—ওই যে ওলন্দাজগুলো এখানে থেকেও এখানে নেই, ওদেরই মত ছিলাম আমি। যখনই নিজেকে বেশ করে জাঁকিয়ে নিয়ে বসতাম, তখনই আমি সবচেয়ে অন্যমনস্ক থাকতাম। কোনদিন আমি সত্যকার অকপট হতে পারি নি; কেবল যখন আমি খেলাধুলোয় মেতে থাকতাম, নয়তো সৈনিক জীবনে, যখন নিজেদের আমোদের জন্য

নাট্যাভিনয় করতাম, তখন ছাড়া। দুটি ক্ষেত্রেই কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আমাদের পালন করে চলতে হতো, যা তেমন দায়িত্বপূর্ণ ছিল না বলে মেনে চলতে আমাদের ভালই লাগত। এমন কি আজ অবধি, রোববারে তিলধারণের জায়গা মেলে না যখন স্টেডিয়ামে আর থিয়েটারে, তখনই আমার মনে জেগে ওঠে আমার আগেকার অদ্বিতীয় আন্তরিক ভালবাসা, জগতের ওই দুটি জায়গায় একমাত্র এখনো আমি নিজেকে ভাবতে পারি নিষ্কলুষ।

কিন্তু আমার এই মনোভাবের সমর্থন কে কববে, বলুন ? দুনিয়ায় এই যে প্রেম, মৃত্যু, আর দরিদ্রকে দান করা—এ সবই তুচ্ছ কে করবে ? কিন্তু না করেই বা উপায় কি ? ইসোল্‌ডের প্রেম উপন্যাসে কিংবা রঙ্গমঞ্চেই কল্পনা করা চলে, অন্যত্র নয়। মুমূর্ষু ব্যক্তিদের দেখে অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, তারা স্ব স্ব ভূমিকার মূল রূপটি যেন উপলব্ধি করতে পেরেছে। আমার দরিদ্র মক্কেলদের মুখের বুলি শুনে বরাবর আমার মনে হয়েছে, একই ছন্দে ওগুলো গাঁথা। কাজেই, সমাজে থেকেও মানুষের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে আমি উদাসীন ছিলাম ; কাকে কি প্রতিশ্রুতি দিলাম, কি দিলাম না, সে বিষয়ে আমার মাথাব্যথা না থাকাই স্বাভাবিক। যথেষ্ট সৌজন্য এবং আলস্য আমার ছিল, যার সাহায্যে অপরের প্রত্যাশা অনুযায়ী আমার কর্মক্ষেত্রে, পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে আমি নিজেকে গড়ে তোলবার ভাণ করতে পারতাম, কিন্তু আমার ঔদাসীন্য এসেই সবকিছু ভেস্তে দিত। এক-দ্বৈত নীতির আশ্রয়ে আমি সারাটা জীবন যাপন করে এসেছি, আর আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান বোধহয় তখনই প্রসূত হয়েছে যখন আমি সবচেয়ে বেশী অনাসক্ত, উদাস ছিলাম। এই কি যথেষ্ট নয় ?—উপর্যুপরি এত বেচাল চেলেও, তার ওপর এই মনোভাব, এর জন্য নিজেকে আমি মাফ করতে পারলাম না, আমার নিজের মাঝে নিজের আশে পাশে যে সমালোচকের শনিদৃষ্টি পরিস্ফুট হয়ে উঠল—তার বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল

আমার সমস্ত মন, তারই প্ররোচনায় কি আমি চাইলাম না পালানোর পথ খুঁজতে ?

বেশ কিছুকাল আপাতদৃষ্টিতে আমার জীবনধারা দেখে কারো সাধ্য ছিল না কোন পরিবর্তন ধরে। আমি ওদিকে ছেড়ে দিয়েছি জীবনের রাশ। আর সেই সাথে, যেন ইচ্ছা করেই লোকে বাড়িয়ে দিল আমার স্তুতি। আর সেখানেই বাধল যত গণ্ডগোল। 'সবাই যখন প্রশংসা করবে, তখনি তোমার দুঃসময়!' কথাটা বোধহয় আপনার অজানা নয়। হায় রে, যে জন কথাটা বলেছিলেন, ভারি গভীর জলের মাছ ছিলেন নিশ্চয়। আমার দুঃসময়! ফলে, জীবনের এঞ্জিন অত্যন্ত খামখেয়ালীর মত যেখানে সেখানে থেমে যেতে লাগল।

তারপর আমার দৈনন্দিন জীবন আচ্ছন্ন করে হঠাৎ এল মৃত্যু-চিন্তা। আর কতদিন এ-জীবনের মেয়াদ, আমি গুণতে শুরু করে দিলাম। ভাবতাম আমার বয়সে আমারি জানা শোনার মধ্যে যত লোক মরেছে, তাদের কথা। মন আমার পাগল হয়ে উঠত, আমার কর্ম অসম্পূর্ণ রেখেই চলে যেতে হবে—এই চিন্তায়। কোন্ কর্ম ? তা জানি না। সত্যি বলতে, আমি যে জীবন যাপন করছিলাম, তা কি নিতান্তই যাপনীয় ? কিন্তু, ঠিক সে-ভাবনা তত ছিল না আমার। আসলে, হাস্যকর এক ভয়ে আমি ত্রস্ত হয়ে পড়লাম : যতদিন না জীবনের প্রতিটি ভাঁওতা নিজমুখে ব্যক্ত করছে, ততদিন মানুষের কপালে মরণ নেই। ভগবান কিংবা তাঁর কোন প্রতিভূর কাছে ব্যক্ত করবার প্রশ্ন ওঠে না ; অত কাঁচা লোক আমি ছিলাম না, তা আপনি বুঝতেই পারছেন। না ; মানুষের কাছে, কিংবা ধরুন, ভালবাসার কোন পাত্রীর কাছে, স্বগতোক্তি করবার কথা বলছি আমি। তা নইলে, জীবনে যদি একটি অন্তত মিথ্যাও আত্মগোপন করে থাকতে পারে, মৃত্যু এসে সে মিথ্যাকে দেবে স্থিতি। আর কেউ জানতে পারবে না তার পশ্চাতে অবলুপ্ত

সত্যটির কথা কারণ একমাত্র যে জানত সেই সত্য—সে ততক্ষণে মগ্ন হয়েছে চিরনিদ্রায়, নিয়ে গেছে সেই সত্যের সন্ধান। কোন সত্যের এই চিরন্তন অপমৃত্যু—আমার কাছে অভাবনীয়, অসহ্য ছিল; ভাবতেও গা আমার ঘুলিয়ে উঠত। আজ অবশ্য, আপনাকে বলছি, ও-কথা ভাবতেও আমার গায়ে জাগে সূক্ষ্ম এক আনন্দের শিহরণ। আর দশজন যে সত্যের অন্বেষণ করছে, মনে করুন আমি একাই কেবল তার হদিস রাখি,—তিন-তিনটে দেশের পুলিশ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে যে জিনিসের খোঁজে, সে ধন আমার ঘরেই লুকিয়ে রেখেছি, —সে চিন্তা যে কতদূর সুখপ্রদ আপনি জানেন না। না, সে-কথা এখন থাক। যে সময়ের কথা বলছি, তখনো আমি কোন সমাধান না পেয়ে দিনে দিনে ক্লিষ্টতর হয়ে উঠছিলাম।

কোনমতে সবকিছু বজায় রেখে চলছিলাম অবশ্য। একটিমাত্র মানুষের মিথ্যায় শত-শত যুগের ইতিহাসে কতটুকুই বা কলঙ্ক পড়তে পারে? ছোট খাট এক সামান্য অপরাধকে সত্যের উদার আলোয় টেনে আনবার বাহাদুরিই বা কেন খামকা, যে-অপরাধ কাল পারাবারে লীন হয়ে গেছে সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত এককণা বালুর মত? মনকে এমনো বোঝালাম যে শরীরের মৃত্যু জিনিসটাই—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা দেখেছি, তা থেকেই বলতাম—যথেষ্ট বড় শাস্তি; সব পাপ তাতেই খণ্ডন হয়ে যায়। মোক্ষ তাতেই মিলে যায় (অর্থাৎ, চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার অধিকার) কাল-ঘামের অব্যক্ত যন্ত্রণার মাঝে। তা সত্ত্বেও মনটা অস্বস্তিতে ক্রমেই পূর্ণ হয়ে উঠল। যেন যমরাজ সর্বদা প্রহরা দিচ্ছেন আমার বিছানার পাশে; এই চিন্তা নিয়েই রোজ সকালে আমার ঘুম ভাঙত, আর, কাজে-কাজেই, অন্যের স্তুতি আমার কাছে দুর্বিসহ ঠেকতে লাগল। মনে হতে লাগল, প্রতিটি স্তুতিবাদের সাথে-সাথে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে মিথ্যার রাশি, অচিন্তনীয়-রূপে।

এমন এক দিন এল যখন আমি সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে

পৌঁছলাম। প্রথম প্রতিক্রিয়াটা প্রচণ্ড রূপ নিয়ে এল। মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছু যখন নই আমি, তখন নিজের সব কথাই আমি ফাঁস করে দেব, প্রকাশ করে দেব আমার দ্বিচারিণী প্রকৃতির কেচ্ছা ওইসব স্তুতি বিলাসীদের মুখের ওপর, ওরা পেটের খবর জেনে ফেলবার আগেই। সত্যের খাতিরে সবরকম প্রতিকূলতাই আমি মেনে নেব। আমাকে আচ্ছন্ন করা সেই অট্টহাসিকে বাগে আনবার লোভে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলাম জনসাধারণের উপহাসের মাঝে। বস্তুত, সমালোচনা এড়িয়ে যাবার এও এক ছুতো। ওদের হাসি নিজের পক্ষে টেনে নেবার—বরং নিজেকে ওদের হাসির স্বপক্ষে পরিগণিত করবার এক অজুহাত। যেমন ধরুন, রাস্তায় হঠাৎ ধাক্কা মেরে অন্ধ পথিককে ফেলে দেবার কল্পনা করতাম আমি; সে কল্পনায় যে অপ্রত্যাশিত গোপন সুখ আমি উপভোগ করতাম, তা থেকেই মালুম পড়ত কি-পরিমাণ ঘৃণাই না আমি করতাম অন্ধদের। রোগীদের হুইল চেয়ারের চাকা লুকিয়ে-চুরিয়ে পাংচার করে দেবার ফন্দীও ঘুরত আমার মাথায়, আর ঘুরত মজুরদের মইয়ের নীচে গিয়ে তারস্বরে 'হারামজাদা শ্রমিক কাঁহাকা!' বলে চেঁচিয়ে ওঠবার ফন্দী; গলির মধ্যে ঢুকে গাঁট্টা মেরে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মাথা আলু করে দেবার ফন্দী। এ-সব করবার কত স্বপ্নই দেখতাম, তবু কিছুই করতে পারতাম না, নয়তো, করে থাকলেও আজ আর মনে নেই। আর যাই-হোক, 'ন্যায়' কথাটা শুনলেই আমার মাথায় রোখ চেপে যেত; অবশ্য আদালতে ভাষণ দেবার সময় কথাটা নিতান্ত ব্যবহার না-করলে আমার চলত না। আর, তার প্রতিশোধ তুলতাম, সর্বসাধারণ্যে লোকের পরোপকারী বৃত্তিগুলো নিয়ে উপহাস করে; একটি ঘোষণা-পত্র শীঘ্রই প্রকাশ করব বলে প্রচার করে দিলাম, যে-পত্রে অত্যাচারিত জনসাধারণের সঙ্গতিপন্নদের ওপর অত্যাচার সম্বন্ধে আলোচনা থাকবে। একদিন আমি যখন এক রেস্তোরাঁয় বসে বাগ্দাচিংড়ি খাচ্ছি মনের সুখে,

তখন একটা ভিখারী এসে জ্বালাতন শুরু করল দেখে আমি মালিককে ডেকে ভিখারীটাকে দূর করে দিতে বললাম, তারপর মালিককে খুব তারিফ করলাম সজোরে, সেই ন্যায়ের অবতার যখন ভিখারীটাকে 'যতসব উড়ো-খই, হাড়-জ্বালানী!' বলে দূর করে দিয়ে এল। আরো সে বলল, তোমরা কতদূর অসহনীয়, বুঝতে, যদি এইসব ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোকদের স্থলে নিজেদের বসিয়ে কল্পনা করতে!' শেষ-অবধি আমি আমার শ্রোতাদের কাছে বলে বসতাম যে রাশিয়ান সেই জমিদারের চরিত্র আমার ভারি ভাল লাগে, কিন্তু তাঁর পন্থা আজকাল আর অনুসরণ করা এ-যুগে যে অসম্ভব হয়ে উঠেছে, ভারি অনুতাপের কথা। তিনি সবার জন্যেই উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করতেন: যারা তাঁর পায়ে সর্বদাই লুটিয়ে পড়ত তাদেরো যেমন, তেমনি যারা তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত না তাদেরো জন্যে ছিল এই ব্যবস্থা, কারণ দুই শ্রেণীরই লোক ধৃষ্টতা-দুষ্ট ছিল, অত্যধিক সাহস না-থাকলে কি ও দুটোর একটাও তারা করত?

আমার অপরাপর বাড়াবাড়ির কথাও মনে পড়ে। সবে আমি 'পুলিশের প্রশস্তি' আর 'গীলোটিন-মাহাত্ম্য' নামে দুটি রচনায় হাত দিয়েছিলাম। তার ওপর, আমি রোজ জোর করে গিয়ে হাজির হতাম সেইসব বিশেষ-বিশেষ কাফেতে, যেখানে নিয়মিত এসে জড় হতেন পেশাদার সব মানব-প্রেমিক চিন্তাবিদেরা। অতীতের সুনাম-বশে আমার আগমন সর্বদাই স্বাগত ছিল। সেখানে, যেন নিজের অগোচরেই, আমি নিষিদ্ধ নানা-কথা বলে ফেলতাম: 'দোহাই ভগবান...' হয়তো বললাম, কিংবা ছোট্ট করে, 'হায় ঈশ্বর...' ইত্যাদি! জানেন তো কেমন লাজুক নিরীহ প্রকৃতির লোক আমাদের কাফে-বিহারী নাস্তিকেরা। মুহূর্তখানেক তাঁরা কিং-কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তেন অমন প্রচণ্ড কথা শুনে, পরস্পরের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতেন, তারপর ফেটে পড়ত দারুণ ভীতি। কেউ বোঁ করে কাফে ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন পা টিপে-

টিপে, অন্যেরা কলরবে বক্‌বক্‌ করে যেতেন কোন-কথায় কান না-দিয়ে, কিন্তু সবারই সর্বাঙ্গ কুঁকড়ে, কুঁচকে মোচড় দিয়ে উঠত, যেন শয়তানের গায়ে কেউ শান্তির জল ছিটিয়ে দিয়েছে।

ভাবছেন, এসব আমার ছেলেখেলা! কিন্তু, ছোট-খাট এই ছ্যাবলামোর মধ্যে যে গুরুতর কোন কারণ ছিল না, কে বলতে পারে? আমি আর সবার খেলা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে ভারি আমোদ পেতাম আর চাইতাম আমার সমস্ত সুনাম ধ্বংস করে দিতে, যে সুনামের কথা ভাবতেও আমার সারা গা জ্বলে উঠত। 'আহা, আপনার মত লোক···' ভারি অমায়িক গলায় লোকে যেই বলত, আমি ফ্যাকাশে হয়ে যেতাম। তাদের প্রশংসা তো সর্বসাধারণের মনোভাবের পরিচায়ক নয়,—কি করে তা সর্বসাধারণের মনোভাব হতে পারে, যদি আমারই সায় তাতে না থাকে? কাজেই আমি চাইতাম সবকিছু ধামাচাপা দিয়ে দিতে – সমালোচনা, প্রশংসা, সব; সবকিছুর ওপর চাপিয়ে দিতে উপহাসের এক মুখোস। অন্তরে আমাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল যে আবেগ, তাকে মুক্তি দেওয়াই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। নিজের স্বরূপ সবার সামনে উদঘাটিত করবার জন্য আমি চাইতাম জনসাধারণের মন থেকে আমার মোমের পুতুলের ছবিটা সরিয়ে ফেলতে। তরুণ উদীয়মান আইনজ্ঞদের এক প্রীতি-সম্মেলনে আমাব উপদেশ চাওয়া যখন হল, আমি একদিন আর সহ্য করতে পারলাম না বার-এসোসিয়েশনের সভাপতির মুখে আমার অবিচ্ছিন্ন স্তুতি। আমার সারা গা জ্বলতে লাগল। আর থাকতে পারলাম না। প্রত্যাশিত উদ্দীপনা ও আবেগ নিয়েই শুরু হল আমার ভাষণ; কিন্তু অচিরেই সব আবেগ দমন করে, পথে এলাম। হঠাৎ আমি উপদেশ দিতে শুরু করলাম যে সন্ধিই হচ্ছে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। আধুনিক সন্ধির কথা আমি বলছি না, ওদের জানালাম, যে একসাথে একজন সাধু আর একজন চোরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চোরের পিণ্ডি সাধুর ঘাড়ে চাপিয়ে খামকা

বেচারাকে অপবাদে নাজেহাল করা অন্যায়। আমি বলি কি চোরটারই পক্ষ সমর্থন করা চাই, সাধুর অপরাধ যা কিছু, নির্মমভাবে তা টেনে বের করে দেখানো চাই। এ প্রসঙ্গটা ভারি পরিষ্কার ভাষায় আমি ওদের বুঝিয়ে দিলাম ঃ

'ধরা যাক, আমি একজন গোবেচারা নাগরিকের পক্ষ সমর্থন করছি, যে নাকি ঈর্ষ্যাপরবশ খুন করে বসেছে। জুরী মহোদয়, ভেবে দেখুন ( আমি বলতাম ) কত ঘৃণ্য ব্যাপার এই রেগে যাওয়াটা—যখন মানুষ দেখে, স্রেফ শয়তানির খাতিরে কোন নারী সেই পুরুষের স্বাভাবিক সততা খতিয়ে দেখছে। কিন্তু আরো মারাত্মক অপরাধ হলো বিচারকের আসনে আমার মত জাঁকিয়ে বসা, জীবনে কোনদিন সৎকর্ম না করা সত্ত্বেও, কখনো কারো কাছে না ঠকেও ; তাই না ? আমি মুক্ত, সবরকম আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ আমি, তবু, বলুন তো, কে আমি ? অহঙ্কারে আমি চতুর্দশ লুই, কামনায় রামপাঁঠা, ক্রোধে ফ্যারাও, আলসের রাজা। কাউকে খুন করি নি আমি ? না, এখনো কাউকে করি নি, ঠিকই ! কিন্তু অযোগ্য পাত্রে আমি মৃত্যু বর্ষিত হতে দিই নি ? বোধহয় দিইছি। আর, বোধহয় ভবিষ্যতেও দিতে পিছ পা হব না। কিন্তু এই যে লোকটা—বেচারার দিকে একটি বার চেয়ে দেখুন—আর কোনদিন এ কোন কিছু করতে পারবে না। এখনো ওর বিস্ময়ের অবধি নেই ওর কৃতকর্মের কথা ভাবতে।'—এই ভাষণ শুনে ভারি হতাশ হলো আমার তরুণ সহকর্মীরা। কয়েক মিনিট বাদে, তারা ভাবল বোধহয় ওদের হাসাবার জন্যই ও-কথা আমি বলেছি। ওরা আরো আশ্বস্ত হলো যখন আমার সিদ্ধান্ত শুনল ওরা, যখন আমি ব্যক্তির প্রসঙ্গ তুললাম, তুললাম ব্যক্তির অধিকার প্রসঙ্গ। সেদিন, স্বভাববশত, অন্যান্য দিনের মতই শেষ করে ফেললাম আমার ভাষণ, মামুলি ধরনে।

এই সব হাস্যকর কীর্তি ঘন ঘন করে অন্তত লোকের মতে আমি বিশৃঙ্খলা ঘটাতে শুরু করলাম। তাদের মত বদলাতে পারলাম

না যে, সে কথা না বললেও চলে ; আবার নিজের মতও বদলাতে পারলাম না। আমার শ্রোতাদের মুখে যে বিস্ময় ফুটে উঠত, কেমন যেন তূষ্ণীভূত বিরক্তি, ঠিক যেমনটি আপনার মুখে দেখছি—দোহাই, প্রতিবাদ করবেন না—তা দেখে আমি মোটেই শান্তি পেতাম না। দেখুন, নিজেকে নিষ্কলুষ করতে গেলে নিজেকে কেবল অভিযুক্ত করলেই চলে না ; তা যদি চলত, তবে এতদিনে আমি নিরীহ মেষ-শাবকটি হয়ে যেতাম। একটি বিশেষরূপে নিজেকে অভিযুক্ত করা চাই, যা যথাযথ আয়ত্ত করতে আমার বহুদিন লেগেছে। পদ্ধতিটা আবিষ্কার করলাম তখনই, যখন অত্যন্ত নিঃসঙ্গতম পরিস্থিতিতে পড়লাম গিয়ে। তার আগে পর্যন্ত সেই অট্টহাসি শুনে আমি কোন্ পথে যে ভেসে চলছিলাম, নিজেই জানতাম না, অক্লান্ত পরিশ্রম করেও পেরে উঠছিলাম না সেই হাসির কল্যাণকর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে, যার নম্র ভাবটি আমার প্রাণে অত্যন্ত বড় হয়ে বাজত।

ওই দেখুন, মনে হচ্ছে জোয়ার আসছে সমুদ্রে। এখুনি হয়তো নৌকো ছেড়ে দেবে ; দিন ফুরিয়ে এল। ওই দেখুন, ওই ওপরে কেমন একজোটে হাজির হয়েছে পায়রাগুলো। একটার গায়ে অন্যটা কেমন গা লাগিয়ে জড়ো হচ্ছে নীরবে, আলো ক্রমে ফিকে হয়ে আসছে। কি বলেন, এমন ভয়াল মুহূর্ত উপভোগ করতে গেলে আমাদের চুপচাপ থাকাই বাঞ্ছনীয় নয় কি ? কি বললেন ? ভারি ভাল লাগছে আমার কথা ? অত্যন্ত সহৃদয় আপনি। তা ছাড়া, এখন দেখছি আমার সমূহ বিপদ, যদি সত্যিই এ সব কথা আপনার ভাল লেগে গিয়ে থাকে। কিন্তু অনুতপ্ত বিচারক সম্বন্ধে কোনও ব্যাখ্যা করবার আগে আপনাকে আমি লাম্পট্য আর লৌহ কপাট সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

## পাঁচ

না, ভায়া, নৌকোটা তীরবেগেই ছুটে চলেছে। কিন্তু, স্থইডারসী যে মরা সমুদ্রেরই সামিল। কুয়াসার বুকে হারিয়ে যাওয়া ওর সমতল বেলাভূমির যে কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ, তার ঠিক ঠিকানা নেই। কাজেই নৌকো আমাদের ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে কোনও নিশানার তোয়াক্কা না রেখেই। কি বেগে যে চলেছি, তা নিরূপণ করা অসম্ভব। সামনেই চলেছি আমরা তবু কোন পরিবর্তনই চোখে পড়ছে না। এ যেন নৌকো-বিহার নয়, স্বপ্ন দেখা।

এরই ঠিক উল্টো কথা আমার মনে হয়েছিল গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে। দিগন্তে অনবরত জেগে উঠছে নতুন নতুন দ্বীপ। গাছপালা-হীন তাদের পিঠগুলো এঁকে দেয় আকাশের সীমানা, আর তাদের পাথুরে বেলাভূমির সাথে সমুদ্রের সে কী বৈপরীত্য! কোন গণ্ডগোল হবার আশঙ্কাই নেই; উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় সবকিছু, সবকিছুই যেন পথের নিশানা দিতে প্রস্তুত। আর একটা দ্বীপ থেকে অন্যটায় আমাদের ছোট্ট দোদুল্যমান নৌকোয় চেপে দিনরাত অবিশ্রান্ত যেতে যেতে আমার মনে হত, যেন মেঘের ভেলায় চড়ে চলেছি, কলহাস্যমুখর ঠাণ্ডা ঢেউয়ের ফেনার ওপর দিয়ে। সেই থেকে আমার অন্তরেই কোথায় যেন পাকা জায়গা কায়েম করে নিয়ে ভেসে চলেছে পুরো গ্রীসটা, অক্লান্তভাবে, আমার স্মৃতির উপকূলে।.... সবুর, সবুর! আমিও ভেসে চলেছি, আমি হঠাৎ কাব্যি করতে শুরু করলাম যে! বাঁচান আমায়, ভায়া, দোহাই!

ভাল কথা, আপনি কি গ্রীসে গিয়েছেন? না? তবে তো ভালই হলো। ওখানে গিয়ে আমাদের কি কাজ, বলুন? ওখানে তাদেরই

যাওয়া সাজে, যাদের অন্তঃকরণ নির্মল। জানেন তো, ওখানে বন্ধুরা জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরাধরি করে আজো পথে পথে চলে? হ্যাঁ, মহিলারা ঘরেই থাকেন আর প্রায়ই দেখা যায় মাঝ-বয়সী, হোমরা চোমরা গোছের গুঁফো কোন ভদ্রলোক হয়তো মুরুব্বির মত গুরুগম্ভীর পদক্ষেপে ফুটপাথ বরাবর চলেছেন তাঁর বন্ধুর হাত জড়িয়ে। অনেকটা প্রতীচ্যের ধারা, তাই না? আমারো কথাটায় না বলবার কিছু নেই। কিন্তু, বলুন দেখি, পারী নগরীর পথে আমার হাত ধরে চলবার মর্জি আপনার হবে কি কস্মিন্‌কালে? না, না, আমি ঠাট্টা করছি। জগতে অন্তত আমাদের শোভন অশোভন জ্ঞানটা ষোল আনা আছে। খালি ধেনোতেই আমাদের পা একটু বেচাল পড়ে, এই যা। গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে যাবার আগে আমাদের দরকার আপাদমস্তক শুদ্ধ করে নেওয়া। সেখানকার বাতাসই নির্মল, সেখানকার সমুদ্র আর সর্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদও নিষ্পাপ, স্বচ্ছ। কিন্তু আমরা?

আসুন না, এই ডেক চেয়ারে বসা যাক। কি কুয়াসা! আমার মনে হচ্ছে লৌহ-কপাট সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলব ভেবেও বলি নি এখনো। আজ্ঞে, হ্যাঁ, যা বলছি, তা-ই বলব। বহু সংগ্রামের পর, আমার সব ঔদ্ধত্যের শেষে, উদ্যমের ব্যর্থ প্রয়াসে নিরাশ হয়ে হয়ে, ঠিক করে ফেললাম—মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। না, না, কোন মরুদ্বীপের সন্ধান আমি করি নি। কোন দ্বীপ কি আর নির্জন আছে? আমি আশ্রয় নিলাম নারীর শয়ন কক্ষে। জানেন তো, কোন অক্ষমতার জন্যই কখনো তারা পুরুষকে বিব্রত করে না; বরং তাদের প্রচেষ্টা হলো, আমাদের শক্তিকে অবমানিত কিংবা অসহায় করে ফেলা। সে জন্যই তো নারী—যোদ্ধার নয়—অপরাধীর জীবনে চরম বর। অপরাধীর জীবনে নারী হলো বন্দর, আশ্রয়; সাধারণত অপরাধী ধরা পড়ে তাই নারীর সুখ-শয়নে। এই ধূলির স্বর্গে নারীই কি আমাদের একমাত্র সম্বল নয়? বিপদে পড়ে আমিও তাই আমার

বন্দরে গিয়ে তাড়াতাড়ি তরী ভিড়ালাম। তবে, আগের মত বাক-ফট্টাই দিয়ে তাদের মন রাঙানো ছেড়ে দিলাম। স্বভাব দোষে, ওদের নিয়ে একটু খেলিয়ে বেড়ানো তবু ছাড়তে পারলাম না। তবে আগের মত নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা আমার পক্ষে আর হয়ে উঠল না। এ কথা প্রকাশ করতেও আমি দ্বিধা করছি, পাছে আরো একগাদা নিষিদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে বসি ঃ কেন যেন আজ আমার মনে হচ্ছে, সে সময়টা আমি সত্যিই প্রেমের কাঙাল হয়ে উঠেছিলাম। ভারি অশ্লীল আমি, তাই না? যাই হোক, গোপন এক যন্ত্রণায়, কিসের এক বিরহে নিজেকে ফাঁকা মনে হতে লাগল, বাধ্য হয়ে আমি কয়েকটা জায়গায় প্রতিজ্ঞা করে বসলাম, কতক দায়ে পড়ে, কতক কৌতূহল বশত। যেহেতু আমার ভালবাসার তাগিদ জাগল মনে আর ভালবাসা পাবারও আকাঙ্ক্ষা জাগল, আমার মনে হলো, আমি বুঝি প্রেমে পড়েছি। অর্থাৎ কিনা, নিজেকেই আমি উপহসিত করে তুললাম।

অনেক অভিজ্ঞতার ফলে, জীবনে আমি যে সব প্রশ্ন সাধারণত এড়িয়ে চলতাম, তারই কিছু কিছু প্রশ্ন নিজের মনে করে বসতে লাগলাম। হঠাৎ করে হয়তো কাউকে জিজ্ঞেস করে বসতাম ঃ 'আমায় তুমি ভালবাস?'—জানেন আপনি, এমন পরিস্থিতিতে পাল্টা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক ঃ 'আর তুমি?'—যদি আমি জবাব দিয়ে বসতাম, হ্যাঁ, তবে মনে হতো, নিজের অগোচরেই অনেকখানি যেন বাঁধা পড়ে গেলাম। যদি বলতাম, না, তবে আমার আর ভালবাসা পাওয়া ঘটে উঠত না, অযথা কষ্টই মিলত। যে আবেগের মাঝে নিজেকে আমি সুস্থির করে রাখতে পারতাম, তা হাতছাড়া হয়ে যায় পাছে, তাই আমার সঙ্গিনীর কাছ থেকে যতটা পারি আমি আদায় করে নিতাম। ফলে নিত্য নতুন প্রকাশ্য প্রতিজ্ঞায় ক্রমেই আমি বাঁধা পড়ে যেতে লাগলাম আর হৃদয়কে আমার উত্তরোত্তর ভাবপ্রবণ করে ফেলতে লাগলাম। এইভাবে এক নকল রিপুর উত্তেজনা

সৃষ্টি করতে আমি এমন পটু হয়ে পড়লাম যে আমার সঙ্গিনী আমার কাছে প্রেম সম্বন্ধে এত খোলা মন নিয়ে আলোচনা করতে পারত, মনে হতো, কোন তাকিক বুঝি বর্ণ-বৈষম্যহীন সমাজের স্বপক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছেন। এমন প্রত্যয়, ভারি ছোঁয়াচে, তা আপনি জানেন। ও-ভাবে আমি প্রেমের বুলি আওড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই আরো বাঁধা পড়ে গেলাম। কিন্তু সঙ্গিনী যখন ধীরে ধীরে উপপত্নীর আসন পাতল, দেখলাম, আবেগের চাপে পড়ে প্রেমের বুলি আওড়াতে শেখানো যায়, কিন্তু প্রেম দিতে শেখানো যায় না। টিয়াপাখীকে ভালবাসবার শেষে, শয্যাসঙ্গিনী রূপে পেতাম এক নাগিনী! কাজেই, কেতাবে লেখা আদর্শ প্রেমের সন্ধান জীবনে কোথাও না পেয়ে আমি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম সর্বত্র।

কিন্তু অভ্যাস তো আমার ছিল না! ত্রিশ বছরের বেশী দিন ধরে আমি কেবল নিজেকেই ভালবেসে এসেছিলাম। অতদিনের অভ্যাস কি সহজে মরে? সে অভ্যাস কাটল না, কাজেই রিপুর ছিনিমিনি নিয়েই বেড়াতে লাগলাম। প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞায় বাঁধা পড়তে লাগলাম। আগে যেমন আমার অগণ্য সঙ্গিনী ছিল, তেমনি তখন আমি জুটিয়ে ফেললাম অগণ্য প্রেয়সী। ফলে, আমার দুঃখের বোঝা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। যে যুগে আমি উদাস থাকতে পারতাম, তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যথা দিতে লাগলাম অপরকে। আপনাকে কি বলেছি? আমার সঙ্গিনী সেই তোতা, হতাশ হয়ে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করবে ঠিক করল। ভাগ্যক্রমে আমি ঠিক সময়ে গিয়ে অকুস্থলে পৌঁছেছিলাম, তাই ওর হাত ধরে কোনমতে ওকে বাঁচালাম, যতদিন না ওর প্রিয় সাপ্তাহিকে-পড়া সেই ইঞ্জিনিয়র তার কাঁচা পাকা চুল সমেত বলীদ্বীপ ভ্রমণ করে ওর কাছে ফিরে এল। যাই হোক, অখণ্ড আনন্দ-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার বদলে, (প্রেমের এই রকম চিত্রই তো সাধারণের মনে আঁকা আছে), উত্তরোত্তর আমি বাড়িয়ে চললাম আমার পাপের বোঝা, ক্রমেই আমি ধর্মপথ

থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। ফলে, প্রেমের ওপর আমি এমনই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লাম যে বহু বছর ধরে La Vie en Rose (গোলাপী জীবন) কিংবা Liebstcd-জাতীয় গান শুনলেই আমার দাঁত কিড়মিড় করে উঠত আপনা থেকেই। সেইজন্য আমি নারী সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইলাম। চাইলাম ব্রহ্মচারী গোছের জীবন যাপন করতে। ভাবলাম, এ ভাবে হয়তো নারী-সঙ্গে তৃপ্তি পাব। কিন্তু এ-ও দেখলাম প্রেম নিয়ে ছিনিমিনি খেলারই আর একটা রূপ। কামনা ছাড়া, নারীর সঙ্গ আমার কাছে দারুণ ন্যক্কারজনক মনে হতে লাগল; আর আমিও তাদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠলাম বই কি। আর ছিনিমিনি খেলা নয়, আর অভিনয় নয়—এই বোধহয় পৌঁছে গেলাম আমি সত্যের রাজ্যে। কিন্তু, সুহৃদ্বরেষু, 'সত্য' জিনিসটাই এক পর্বতোপম বিরক্তি!

প্রেমে, ব্রহ্মচর্যে—সর্বত্রই বিফল মনোরথ হয়ে আমি নিজেকে বোঝালাম, একমাত্র পথ এখন রয়েছে লাম্পট্য, প্রেমের একমাত্র প্রতিনিধি যা সব হাসি থামিয়ে দিতে সক্ষম, ফিরিয়ে আনতে পারে স্তব্ধতা, আর এনে দিতে পারে অমরত্ব। সজ্ঞান মাতলামোর একটি পর্যায়বিশেষে, শেষ রাতে, গোটা দুই গণিকার মাঝে শুয়ে, সমস্ত কামনার ঊর্ধ্বে উঠে, দেখবেন, আশা আর যন্ত্রণার কলস্বরূপ থাকে-না, তামাম অতীতটা মনের সামনে পড়ে থাকে লুটিয়ে বেঁচে থাকবার সব জ্বালা যায় অন্তর্হিত হয়ে। চিরটা কালই আমি অমরত্বের পিপাসী ছিলাম, তাই, একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, কোনদিন আমি লম্পটের চেয়ে বেশী কিছু ছিলাম না। এই কি আমার প্রকৃতির যথেষ্ট পরিচায়ক নয়, নয় আমার দুর্দমনীয় আত্ম-প্রেমের একমাত্র ফল? সত্যিই, আমি অমর হবার এক দুর্নিবার কামনায় পুড়ে মরতাম তখন অহর্নিশি। নিজের সাথে আমি এতদূর প্রেমে পড়েছিলাম যে কখনো যেন আমার প্রেমের পাত্রী চোখের আড়াল না হয়, এ-ই ছিল আমার একান্ত কাম্য। জাগ্রত অবস্থায়,

সামান্য একটু আত্ম জ্ঞান থাকলেই মানুষের ভাবনা জাগে যখন, কেন এক কামুক বানর অযথা অমরত্ব লাভ করবে, তখন সেই অমরত্বেরও কোন প্রতিনিধি মানুষের পক্ষে খুঁজে বার করা প্রয়োজন। শাশ্বত জীবনের পিপাসা আমার ছিল বলেই না আমি রাতের পর রাত বারাঙ্গনাদের সাথে কাটিয়েছি একই শয্যায়, পান করেছি বোতলের পর বোতল! কিন্তু, হলপ করে বলতে পারি, সকালে আমার ঘুম ভাঙতেই দেখেছি মুখ আমার ভরে গেছে মরতার তিক্ত স্বাদে। তবু তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরম রভসে কাটাতে পেরেছি। ব্যাপারটা খুলে বলব, সাহস করে? কয়েকটি রাতের কথা এখনো আমার স্মৃতির পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে, যখন আমি কোনও এক ঘৃণিত নাইট ক্লাবে যেতাম কোনও কুইক-চেঞ্জ নর্তকীর আকর্ষণে, যে আমায় সমীহের সাথে তার কৃপাধন্য করতো অকুণ্ঠিত চিত্তে, যার সম্মানার্থে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি এক দেড়ে শয়তানের সঙ্গে হাতাহাতি পর্যন্ত করেছি। রোজ রাতেই আমি সদম্ভ পদক্ষেপে গিয়ে ঢুকতাম প্রমোদ-বিপণিতে, গনগনে লাল আলো আর ধুলোয় ধূসর ওই মর্ত্যের অমরায়, শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ ধরে পান করে যেতাম নির্বিকার চিত্তে। অপেক্ষা করতাম, কখন ভোর হবে; অপেক্ষা করতে করতে গিয়ে গড়িয়ে পড়তাম আমার সাকীর চির-প্রতীক্ষিত বিছানায় যেখানে আমার হৃদয়েশ্বরী যন্ত্রচালিতবৎ প্রাত্যহিক কাজের অবতারণা করত, আর কোন ভূমিকার অপেক্ষা না রেখেই ঘুমিয়ে পড়ত আমার বাহুলীনা হয়ে। সন্তর্পণে কখন দিনের আগমন হতো, আলোর ঝলক এসে পড়ত আমাদের শোচনীয় শয্যার ওপর খেয়াল থাকত না; চকিতে আমি উঠে পড়তাম, নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকতাম মহা ঐশ্বর্যময়ী প্রত্যূষের আশিস-বেষ্টিত হয়ে।

আপনাকে বলতে বাধা নেই, সুরা আর নারীই আমাকে জোগাতে লাগল যেটুকু সান্ত্বনা আমার ললাটে লিখিত ছিল, তার সবটুকুই। এই গোপন তথ্যের কথা আপনার কাছেই বলছি,

সুহৃদ্বর ; এর যথেচ্ছ সদ্ব্যবহার করতে কখনো পেছ-পা হবেন না যেন। তা হলেই বুঝতে পারবেন যে সত্যকার লাম্পট্যেই দিতে পারে মুক্তি, কোন রকম বাধ্যবাধকতার বালাই না রেখে। এতে একমাত্র বশে যে থাকে সে হলো আপন সত্তা ; কাজেই আত্ম প্রেমেই যারা ষোল আনা মশগুল, তাদের পক্ষে এর বাড়া বিলাস আর নেই। অতীতহীন ভবিষ্যৎহীন এক অরণ্য যেন, নেই কোন উন্নতির অঙ্গীকার, নেই কোন নগদ শাস্তি। যে সব জায়গায় এ খেলার আসর বসে, তা এ জগতের একেবারে বাইরে। যে জগতে এ আসর বসে, সেখানে ঢোকবার সময় ভয় আর আশাকে স্বচ্ছন্দে নির্বাসন দেওয়া চলে। সেখানে আলোচনা বা সম্ভাষণের কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। যা চাইতে আসা, তা আপনিই মেলে, এমন কি, অনেক সময় টাকা না ফেলতেই মেলে। একটু ফুর্সৎ দিন, যে সব অপরিচিতা, বিস্মরিতা নারী সে যুগে আমায় সাহায্য করেছিল, তাদের প্রতি এই ফাঁকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে নিই। আজ অবধি তাদের কথা স্মরণ করতে গেলে মন আমার শ্রদ্ধার মত কী এক রসে প্লাবিত হয়ে যায়।'

যাই বলুন না কেন, সেই মুক্তির পূর্ণ সুযোগ আমি নিতে ছাড়িনি। আগাগোড়া পাপে নিমগ্ন এক হোটেলে পর্যন্ত এককালে আমি বাস করতে দ্বিধা করি নি,-- একাধারে প্রৌঢ়া এক গণিকা আর অন্যদিকে অনূঢ়া এক অভিজাত ঘরের তরুণীকে নিয়ে একত্রে ঘর করেছি। প্রথমটির সাথে আমার ছিল নায়ক-প্রণয়ীর সম্বন্ধ, দ্বিতীয়টিকে আমি রেখেছিলাম জীবনের অল্প স্বল্প অভিজ্ঞতা দেবার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গণিকাটির স্বভাব ছিল হুবহু মধ্যবিত্ত ঘরের ; ও শুনছি কোন এক আধুনিক কাগজে লিখতে শুরু করেছে তার জীবন-স্মৃতি। তরুণীটির ওদিকে বিয়ে হয়ে গেল, জীবনে আরো অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পেল, এবং অসামান্য বুদ্ধির কল্যাণে চমৎকার উৎরেও গেল। সেই সাথে আমারো গর্ব করবার মত

জিনিস মিলে গেল; সে কালের কুখ্যাত এক যুব-সজ্ঘ আমাকে তাদের সমপর্যায়ভুক্ত করে নিল যখন। সে প্রসঙ্গ থাক: জানেন তো, অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোকও তার পাশের লোকটির চেয়ে এক বোতল বেশী ওড়ানোর গর্ব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না। বেশ শান্তিতে আমি এ গর্বে গরীয়ান হয়েই ছিলাম; কিন্তু সে গুড়েও বালি পড়ল। আমার যকৃৎ বাদ সাধল, আর দারুণ এক ক্লান্তি, অবসাদ এমন ভাবে আমায় গ্রাস করল যে আজো তার কবল থেকে আমি রেহাই পাই নি। অমর হবার আশায় মানুষ কয়েক সপ্তাহ লালায়িত হতে না হতেই তার মনে জাগে সংশয়—পরদিন সকাল অবধি তার আয়ু টেঁকে কিনা!

এই অভিজ্ঞতার একমাত্র সুফল দর্শালো—আমি যখন আমার নৈশ-অভিযানে ইস্তফা দিলাম—জীবন আমার কাছে কম যন্ত্রণাদায়ক বোধ হতে লাগল। যে অবসাদ দিনরাত আমায় কুরে কুরে খেতে শুরু করল, তারই প্রসাদে আমার অনেক কাঁচামি দূর হয়ে গেল। সবরকম আতিশয্যেই প্রাণশক্তির ক্ষয় হয়, কমে যায় দুঃখভোগ। লাম্পট্য বস্তুটা আদৌ উন্মত্ত নয়; বরং তার উল্টোই। লাম্পট্য হচ্ছে দীর্ঘ নিদ্রারই নামান্তর। একটা জিনিস লক্ষ্য করে থাকবেন আপনি, যারাই ঈর্ষাকাতর, তাদেরই দেখা যায় দারুণ আগ্রহ– কি করে শয্যাসঙ্গিনীরূপে পাওয়া যায় সেই নারীকে যে তার বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। এর মূলে অবশ্য একটা যাচাই করবার ভাব থাকে যে তাদের অমূল্য সম্পদ তাদেরই আছে এখনো। ওই যে, লোকে বলে না? নিজের ধন নিজের ট্যাঁকেই রাখা?—তাই চায় ওরা। কিন্তু আর একটা দিকও আছে, দেখা যায়, অনতিকাল পরেই ওদের ঈর্ষায় ভাঁটা পড়ে। আত্ম-সমালোচনার সাথে কল্পনা মিলে সম্ভূত হয় জৈবিক ঈর্ষা। প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর লোকে আরোপ করে জঘন্য সেই সব সম্ভাবনা যার কবলে লোকে সচরাচর নিজেই পড়ে যায় অনুরূপ পরিবেশে। সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রিয়-সুখের

আতিশয্য কল্পনাকেও যেমন দুর্বল করে দেয়, তেমনি পর্যালোচনা শক্তিকেও। পৌরুষ যতকাল নিষ্ক্রিয় থাকে, ততদিন সব যন্ত্রণাও থাকে নিষ্ক্রিয়। সেইজন্যেই দেখেন না—প্রথম যৌবনের সব মানসিক চাঞ্চল্যাই স্তব্ধ হয়ে যায় প্রথম প্রেয়সীর কাছে বাঁধা পড়বার সাথে সাথেই? আর অনেক ক্ষেত্রে বিবাহও (যা আইনগত লাম্পট্যেরই সামিল হয়ে ওঠে), এইভাবে, পরিগণিত হতে পারে উদ্ভাবন শক্তির, সাহসের একঘেয়ে শ্রাদ্ধ-বাসরে। বাস্তবিক, বন্ধুবর আমাদের দেশের ওই বুর্জোয়া বিবাহ পদ্ধতিতে সমাজের ইতিমধ্যেই নাভিশ্বাস উঠছে; যমালয়ে যেতে আর দেরী নেই বড়।

আমি কি আদিখ্যেতা করছি? হয়তো করছি না, তবু আদত কথা ছেড়ে বড় আজেবাজে বকছি। আপনাকে কেবল বলতে চেয়েছিলাম কয়েক মাসের নৈশ অভিযান থেকে কী শিক্ষাটাই না আমার হয়েছিল! আমার চারিধারে গড়ে উঠল এক দারুণ কুয়াসা, যার ঘনত্ব ভেদ করে সেই অট্টহাসি আর আমার কানে বড় হয়ে বাজত না। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম সেই হাসি। যে ঔদাসীন্য আমায় আগেই আক্রমণ করেছিল, এখন বিনা বাধায় তা প্রভাব বিস্তার করে চলল আমার ওপর। সব আবেগ, অনুভূতির পালা চুকে গেল! মেজাজ বিলকুল নিস্তরঙ্গ রইল; উহু, মেজাজের বালাই-ই রইল না। যক্ষ্মাক্রান্ত ফুসফুস সারে শুকনো হাওয়ায় আর ধীরে ধীরে দম বন্ধ হয়ে আসে সেই ফুসফুসের মালিকদের। আমারো সেই দশা হলো; যতই আরোগ্যের পথে চললাম, ততই মনে হতে লাগল মৃত্যু সন্নিকট। আগের মতই কাজে তখনো যেতাম, যদিও আমার দুমুখতার দরুন আমার সুনাম এর আগেই যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এবং আমার উচ্ছৃঙ্খল জীবনে একটা ছন্দ ফিরে আসতে লাগল আমার কাজের নিয়মানুবর্তিতার কল্যাণে। তবে, মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম এই যে লোকে আমার নৈশ উৎসবের দরুন কখনো তত বিরূপ হয় নি, যত না হয়েছে আমার দুমুখ ব্যবহারে।

আদালতে বসে স্রেফ মুখের কথায় আমি ভগবানের নাম যে প্রায়ই করতাম, তাতেই আমার মক্কেলদের মন অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠত। তাদের বোধহয় ভয় ছিল যে আদালতে ঝানু উকিলের চেয়ে কি বেশী সহায় হতে পারবেন ভগবান স্বয়ং! কাজেই তারা ধরে নিত, আমি হালে পাণি না পেয়েই ভগবানের জের টানছি। সেই ভেবেই ধীরে ধীরে কমতে লাগল আমার মক্কেলের সংখ্যা। মাঝে মাঝে তখনো আমি ওকালতি করতে বসতাম। কালে ভদ্রে, নিজে যা বলছি তাতে বিশ্বাস করি না--সে কথা ভুলে গিয়েই, আমি তুখোর আইনজ্ঞ বলে প্রশংসাও কুড়োতাম। আমার গলা আমিই শুনে চমকে যেতাম তবু, যা বলতে মন চাইত, তা-ই নিঃসঙ্কোচে বলে যেতাম ; আগের মত ভাবে বিভোর না হয়ে উঠলেও থেকে থেকে চমক লাগিয়ে দিতাম বই কি। কাজের বাইরে প্রায় কারো সঙ্গেই মিশতাম না, আর কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে বজায় রেখেছিলাম দু একটা ম্রিয়মাণ সখ্য। এমন কি, কোন কোনদিন নিছক বন্ধুভাবে তাদের সঙ্গে সন্ধ্যাটা আমি কাটিয়ে দিতাম, কামের গন্ধমাত্র না মিশিয়ে : তবে, পার্থক্য ছিল এই যে বিরক্তির চরমে উঠে কারো কোন কথা আর আমি কানে তুলতাম না। গায়ে আমার একটু মাংস লাগল, বুঝলাম, বিপদ প্রায় কেটে গিয়েছে। এবার আমি বুড়োতে শুরু করলাম।

একদিন, আমার এক বান্ধবীকে নিয়ে এক ওসান লাইনার করে আমি গিয়েছি সমুদ্র ভ্রমণে,- বান্ধবীকে বলি নি, আমার ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাবার দরুন সে উৎসব,—ওপরের ডেকের যাত্রী হিসাবে, তা আপনাকে না বলে দিলেও চলে। হঠাৎ, সমুদ্রের বুকে বহু দূরে, আমার চোখে পড়ল ধূসর ইস্পাত বর্ণ জলের ওপর কালো একটি বিন্দু! তক্ষুণি আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম ; প্রবল আলোড়ন জাগল আমার বুকে। আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠছিলাম আর কি, সাহায্যের জন্য মূর্খের মত আর্তনাদ করতে গিয়ে আবার দেখলাম সেই বিন্দুটি।

ভাঙা কিসের একটা টুকরো, কোন জাহাজের পরিত্যক্ত মাল। তবু সেটার দিকে তাকিয়ে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। কারণ, তখুনি আমার মনে পড়ে গিয়েছিল নিমজ্জমান একটি মুখ। যেমন ভাবে বহুদিনের উপলব্ধি করা কোন সত্যের অভিব্যক্তি স্বরূপ কোনও ভাবধারার সামনে অবলীলাক্রমে আপনি নত হতে দ্বিধা করেন না, তেমনি শান্ত মনেই আমি উপলব্ধি করলাম যে, যে আর্তনাদ আমি বহু বছর আগে সেইন্ নদীর বুকে শুনেছিলাম, সে কান্না কোনদিন থামেনি, নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে গিয়ে তা ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ইংলিশ চ্যানেলের বুকে, সেখান থেকে তারপর ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময়, এক সাগরের প্রান্ত থেকে অপরাপর সাগর প্রান্তে; সেই আর্তনাদই এতকাল প্রতীক্ষা করছিল আমার পথ চেয়ে। আরো আমি উপলব্ধি করলাম, এইভাবেই সে আর্তনাদ যুগ যুগ ধরে আমার পথ চেয়েই বসে থাকবে সর্বত্র, নদীবুকে, সমুদ্রবুকে—যেখানে যেখানে আমার অন্নপ্রাশনের দিনের তিক্তবারির বিন্দুমাত্র স্পর্শ থাকবে। এই দেখুন, আজো আমরা জলের ওপর দিয়েই তো যাচ্ছি? এই যে সমতল, একঘেয়ে, অনন্ত জলধি যার সীমা কোথায়, শেষ কোথায় বলা কঠিন, এরই বুকের ওপর দিয়ে কি চলছি না আমরা? কোনদিন কি আমরা আমস্টারডামে ফিরে যাব বলে মনে হচ্ছে? এই শান্তিবারির অনন্ত বিস্তৃতির বাইরে কস্মিন কালেও আমাদের যাওয়া ঘটে উঠবে না। শুনুন। শুনতে পাচ্ছেন না, অদৃশ্য গাংচিলের ডাক? আমাদের পথ চেয়েই গাংচিলগুলো ডাকছে, কিসের দিকে ওরা আমাদের ডেকে নিয়ে যাচ্ছে বলতে পারেন?

এই গাংচিলগুলোই সেদিন ডাকছিল, যেদিন অ্যাটলান্টিকের বুকে দাঁড়িয়ে চিরতরে বুঝে নিলাম আমার নিরাময় হওয়া অসম্ভব, এখনো আমার পিছনে শনি লেগে আছে; এই অভিশপ্ত জীবনেই যতটুকু পারি, টানা পোড়েন করে যেতে হবে। শেষ হয়ে গেল আমার সেই মস্ত-বছরের জীবনের; শেষ হলো সেই সাথে আমার সমস্ত

উন্মত্ততা, সব স্নায়বিক আক্ষেপ। আমায় আত্মসমর্পণ করতেই হলো, মেনে নিতে হলো সমস্ত অপরাধ। শুরু হল আমার লৌহ-কপাটের দম আটকানো জীবন। মধ্যযুগের 'সুখ নাই' নামের সেই কুখ্যাত অন্ধকূপের নাম আপনি শুনেছেন তো? যাবজ্জীবন বহু কয়েদীকে সেখানেই থাকতে হতো পৃথিবীর আর সবার কাছে বিস্মরিত হয়ে। সে বন্দীশালাটা তার দৈর্ঘ্য প্রস্থের জন্যই আরো বেশী কুখ্যাত। উঠে দাঁড়ানো অসম্ভব, এত নীচু; আবার শুতে যাওয়াও অসম্ভব, এত সঙ্কীর্ণ, ছোট। অদ্ভুত এক তের্‌চা ভঙ্গীতে ছাড়া সেখানে ঢোকা ও বাস করা তেমনি অসম্ভব। ঘুমিয়ে পড়লেই হুড়মুড় করে আছাড় খাবেন; জেগে উঠে দেখবেন, কুকুর-কুণ্ডলী মেরে বসে আছেন। ছোট্ট এই ঘরগুলো উদ্ভাবন যে করেছিল, বলিহারি তার বুদ্ধি—সত্যিই বলিহারি! দিনের পর দিন, শরীরের গাঁটে গাঁটে ফিক ধরে আড়ষ্ট যত হতে থাকবেন, ততই আপনি বুঝবেন যে আপনি অপরাধী; আর বুঝবেন, মনের সুখে হাত পা ছড়িয়ে ঘুরে বেড়ানোর অধিকার একমাত্র নির্দোষীদেরই আছে। পাহাড়ের চূড়ায়, সবকিছুর শীর্ষে, জাহাজের সবচেয়ে ওপর তলায় ছাড়া যে লোক থাকতে পারে না, তার পক্ষে ওই 'সুখ নাই'-এর কক্ষে যাওয়াটা কেমন হবে, কল্পনা করতে পারেন? কি বললেন? 'সুখ-নাই'-এ থেকেও লোকে নির্দোষী হতে পারে? অসম্ভব। স্রেফ অসম্ভব! যদি সম্ভব হয়, বুঝব, আমার মতিভ্রম হয়েছে। কুঁজো হয়ে জীবন যাপন করতে হবে নির্দোষীদের—এ অনুমান তিলেকের জন্যও আমি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করি। কে যে নির্দোষী, হলফ করে কেউ আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু কার যে কোথায় গলদ, অনায়াসে আমরা তার বিবরণ দিতে সক্ষম। অন্যের অপরাধের সাক্ষী দিতে প্রত্যেকেই প্রস্তুত—এই আমার বিশ্বাস, এই আমার আশা।

বিশ্বাস করুন, যে মুহূর্তে কোন ধর্ম শুরু করে নীতিবটিকা বিতরণ করতে আর ঢক্কানিনাদে ঘোষণা করে আদর্শ জীবনের পদ্ধতি,

সেইখানেই শুরু হয় তার বিপথ যাত্রা। পাপের সৃষ্টির জন্য কিংবা শাস্তি দেবার জন্য ভগবানের কোনই প্রয়োজন নেই। তার জন্য আমাদের আশে পাশের লোকেরাই যথেষ্ট; যদি থাকে, তার ওপর, আমাদের সাহায্য—তা হলে তো কথাই নেই! আপনি নিদেন-কালের সেই বিচারের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। সশ্রদ্ধ হাসি যদি হেসে ফেলি, দোহাই, মাফ করবেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্তে সেই বিচারের পথ চেয়ে আমি বসে থাকব, কারণ তার চেয়ে শতগুণে নিকৃষ্ট যা— আমায় তারও ভুক্তভোগী হতে হয়েছে: মানুষী বিচার। মানুষের চোখে দোষলাঘবকারী কোন পরিবেশের বালাই নেই; সৎ উদ্দেশ্য প্রসূত কাজও অন্যায়, অসৎ বলে অভিহিত হয়। আপনি অন্তত থুথু-মারা হাজতের নাম শুনে থাকবেন, আধুনিক কোনও এক জাতি-বিশেষ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের খাতিরে যে হাজতের উদ্ভাবন করেছে। ছোট্ট এক বাক্সের চতুর্দিকে দেয়াল গাঁথা, যার মাঝে বন্দী কোনমতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, এক তিলও না নড়ে। এই সিমেণ্ট বাঁধানো খোলসের মধ্যে ওকে ঢুকিয়ে, গলা সমান দরজাটা এঁটে দেওয়া হয়। ফলে কেবল বন্দীর মুখটুকুই দেখা যায়, আর প্রতিটি হাজত রক্ষক—যাতায়াতের পথে—যত খুশী থুতু ফেলে যায় সেই মুখের ওপর। খোলসে বন্দী হয়ে বেচারা মুখটুকু পর্যন্ত মোছবার জন্য হাত নাড়তে পারে না, অবশ্য আইনত ওর চোখ বুঁজে ফেলায় কোন আপত্তি নেই। দেখছেন তো? সুহৃদ্বর, এই হলো মানুষের উদ্ভাবনীর এক নমুনা। ছোট্ট এই মহতকীর্তি বানাতে তার ভগবানের প্রয়োজন হয় নি।

অতএব? দেখা যাচ্ছে, ভগবানের প্রয়োজন একমাত্র—মানুষের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে। আর, আমার চোখে ধর্ম হলো প্রকাণ্ড এক ধোপাখানা—এ ব্যাপার কিছুদিনের জন্য, পাকা তিন বছর যাবৎ, বলবৎ ছিল, তাই বোধহয় এটাকে লোকে ধর্মের পর্যায়ে তোলে নি। সেদিন থেকেই সাবান দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে, মুখ আমাদের ক্লিন্ন,

আমরা পরস্পরের নাক মুছিয়ে দিতেই ব্যস্ত। সকলেই শয়তান, সবাই শাস্তি পেল, আসুন, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখে চুটিয়ে থুতু ফেলি ; তারপর ? চলুন সেই 'সুখ-নাই' হাজতের শরণ নেওয়া যাক। প্রত্যেকেই চায় আগে থুতু মারতে, এই হলো রীতি। বিরাট এক রহস্য আজ উদ্ঘাটিত করব আপনার কাছে, বন্ধুবর। নিদান কালের বিচারের পথ চেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। সে বিচার রোজই সংঘটিত হচ্ছে যে!

ও কিছু না ; এই জোলো হাওয়ায় শরীরটা একটু শির্‌শিরিয়ে উঠছে। আমরা তীরে নামব এবার। এইতো, এসে গেলাম। আপ্ আইয়ে! সবুর ভায়া, একসঙ্গেই যাওয়া যাক বাড়ি ফেরার পথটুকু। আমার বলাই এখনো শেষ হয় নি ; এখনো অনেক কথা বাকি। বাকিটুকু বলতে পারাই হচ্ছে আদত মুস্কিল! ধরুন, কেন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, বলতে পারেন ?—যাঁর কথা আপনি ভাবছেন এই মুহূর্তে ? গাদাপ্রমাণ হেতু ছিল বইকি। মানুষ খুনের পেছনে কোনকালেই হেতুর অভাব হয় নি। কঠিন হলো মানুষের বেঁচে থাকার হেতু খুঁজে পাওয়া। কাজেই পাপ করতে না করতেই জুটে যায় উকীল ; কিন্তু নির্দোষীর ভাগ্যে কটা উকীল জোটে ? কিন্তু, গত দুই হাজার বছর ধরে যেসব হেতুর ব্যাখ্যা আমরা বারবার শুনেছি, তা ছাড়াও মূল একটি হেতু ছিল এই নৃশংস কাণ্ডের পশ্চাতে ; জানি না, কেন এযাবৎ তা এত যত্নে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আসল হেতু হচ্ছে, 'তিনি' জানতেন যে তিনি সত্যিই ষোল আনা নিরপরাধ ছিলেন না। যেসব অপরাধে তাঁকে অপরাধী করা হয়েছিল সে সব দোষে তিনি দুষ্ট না হলেও তাঁর অন্যান্য দোষ ছিল বই-কি—অবশ্য তিনি নিজেও জানতেন না কি কি দোষ। কিন্তু, সত্যিই কি তিনি জানতেন না ? তিনিই তো বলতে গেলে সবকিছুর মূলে ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন নিরপরাধ একদল লোককে কচুকাটা করবার ইতিবৃত্ত। জুডিয়ার সন্তানদের নির্মম হত্যা

কাহিনী কি তিনি শোনেন নি, যে সময় তাঁর বাবা-মা তাঁকে কোলে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্যত্র পালিয়ে বেড়িয়েছেন নিরাপত্তার জন্য ?—তাঁকে বাঁচানোর জন্যই তো অতগুলো নিরপরাধ প্রাণ হরণ করতে হলো ? রক্ত-লোলুপ ওই যে সৈন্যদল, আর দ্বিখণ্ডিত দুগ্ধপোষ্য শিশু—ওদের কাহিনী শুনে তিনি কি মর্মে মর্মে শিউরে ওঠেন নি ? যে ধাতের মানুষ উনি ছিলেন, এত অবিচারের ইতিহাস তিনি আদৌ ভুলতে পারেন নি। আমি তা হলপ করে বলব। তাঁর প্রতিটি কর্মে যে গভীর ব্যথা পরিস্ফুট হয়ে উঠত, তা কি রাতের পর রাত অবিশ্রান্ত রাশেল্-এর কান্না, পুত্রহারা জননীর আক্ষেপ তাঁর সন্তান সন্ততির বিরহে—তারই বহিঃপ্রকাশ নয় ? তাঁর জন্যেই রাশেল্-এর যে সব সন্ততি নির্বিচারে হত হয়েছে, অথচ তিনি বেঁচে আছেন, আর সেই শোকে ক্রন্দনরতা রাশেল্-এর বিলাপে কি রাতে আকাশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় নি ?

ওঁর জীবনের এ কথা জেনেও, মানুষের খুটি-নাটি সব অবগত হয়েও,—এখনো কি বিশ্বাস করা চলে যে অন্যকে হত্যা করাই একমাত্র অপরাধ, নিজেকে মরতে না দেওয়া অপরাধ নয় ?—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, নিজের নিরপরাধ অপরাধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তাঁর পক্ষে আর হাল ধরে থাকা, জীবন ধারণ করা—অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তার চেয়ে ফুরিয়ে যাওয়াই উনি শ্রেয় মনে করলেন, আত্মসমর্থন না করে, অতগুলোর মধ্যে মাত্র একজন জীবিত থাকার বদলে, উনি চলে যেতে চাইলেন আর কোথাও যেখানে হয়তো ওঁকে উচ্চাসন দিতে কেউ দ্বিধা করবে না। ওঁকে সমর্থন করবার কেউ নেই, উনি অভিযোগ করেছিলেন, তাই—বোঝার ওপর শাকের আঁটি—ওঁকেই অভিযুক্ত করা হলো অবশেষে। হ্যাঁ, বোধহয় তৃতীয় এভাঁজেলিস্ত-ই প্রথম ওঁর অভিযোগের কথা চেপে যান। 'কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করে গেলে ?—দারুণ গণ্ডগোলের উক্তি নয় কি ? কাজেই, কচাৎ করে ওটুকু ছেঁটে ফেলা হলো ! মনে রাখবেন, লিউক্

যদি কোন কথা চেপে না যেতেন, তবে ব্যাপারটা কারো নজরেই পড়ত না; অন্তত এত বড় করে কারো চোখে পড়ত না। নিষিদ্ধ যা কিছু, তা নিষিদ্ধ করবার ভার যার ওপর, সেই সবচেয়ে বেশী প্রচার করে ফেলে। এই হলো দুনিয়ার দুর্বোধ্য হালচাল!

তবু, শাস্তিপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে পুরনো পথে আর চলা অসম্ভব। জানি, সুহৃদ, যা আমি বলছি, জেনেই; এমন এক দিন ছিল, যখন আমি জানতাম না ঘুণাক্ষরেও যে পরের মুহূর্তে কি করে আমি গিয়ে উপনীত হব। হ্যাঁ, এই দুনিয়ায় চান যদি, যুঝে যেতে পারেন সহজেই, পারেন প্রেমের ভান করতে, পারেন পড়শীকে চরম নাজেহাল করতে, নয়তো বসে বসে সেলাই বোনার সাথে সাথে পারেন পরনিন্দা চালিয়ে যেতে। কিন্তু, ক্ষেত্র বিশেষে, চালিয়ে যাওয়াটা, স্রেফ বেঁচে থাকাটা অতিমানুষিক। আর 'তিনি' তো অতিমানুষ ছিলেন না। বিশ্বাস করুন। তিনি দারুণ ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠতে কসুর করেন নি। সে জন্যেই তিনি আমার এত প্রিয়। না জেনেই তিনি, আমার বন্ধু, মারা গেলেন।

দুর্ভাগ্যবশত—তিনি চলে গেলেন অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে, আমাদের চালিয়ে যেতে হবে জীবনের ধারা সবরকম পরিস্থিতির মাঝেই, হোক না কেন 'সুখ নেই'-এর লৌহ-কপাটের আড়ালে, যতই জানি না কেন তাঁর নখদর্পণ ধৃত সমস্ত জ্ঞান, তবু আমাদের সাধ্য কি—তাঁর মত করে দেখিয়ে দিই, তাঁর মত করেই মরি? লোকে স্বভাবতই ওঁর মৃত্যুর থেকে খানিক সুযোগ খুঁজে নিতে চায়। আর যাই হোক, তাদের বুদ্ধির বলিহারি, যারা বলেছিল: 'এমন কিছু আহা-মরি দর্শনীয় বস্তু তুমি নও বাপধন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ! যাক, অত কথায় কাজ নেই। ক্রুশের ওপরেই সব সমস্যার চরম নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।' কিন্তু অনেকেই আজ ক্রুশের ওপর গিয়ে হাজির হচ্ছে—বেশ দূরের লোকও যাতে তাদের দেখতে পায়, চাইকি এতদিন ক্রুশের ওপর যে ঠাঁই অধিকার করে বসেছিল,

তাকে পিষে সরিয়ে ফেলতেও লোকে কসুর করবে না। অনেকেই দাক্ষিণ্য দেখাতে আজ প্রস্তুত ঔদার্যের কাণাকড়ি বালাই না-রেখেই। হায় রে! কি অবিচার, কি শোচনীয় অবিচারটাই না ওঁর ওপর করা হয়েছে! ব্যথায় আমার হৃদয় মুচড়ে মুচড়ে ওঠে, সে কথা ভাবলে!

বালাই আর কি! কত সহজেই যে মানুষ অভ্যাসের কবলে পড়ে যায়! এই দেখুন না, যেন আমি আদালতে ভাষণ দিতে বসেছি। দোহাই আপনার, মাপ করবেন; আমার এই ব্যবহারেরও কয়েকটা হেতু আছে বইকি। জানেন তো, এখান থেকে কয়েকটা রাস্তা পেরিয়েই একটা মিউজিয়াম পড়ে; নাম তার 'চিলে ঘরে ঈশ্বর'। সে যুগে লোকে চিলেকোঠায় নিয়ে গিয়ে মৃতদেহ গোরস্থ করত; জানেন তো এখানকার মাটির তলাকার ঘরগুলো সর্বদাই জলে থৈ-থৈ করে। কিন্তু, আশ্বস্ত হোন; আজ তাঁদের ঈশ্বর চিলেঘরেও নেই মাটির তলাকার ঘরেও নেই। হৃদয়ের গহনতলে আজ এরা ওঁকে অধিষ্ঠিত করেছে, বিচারকের আসনে, আর তাঁরই নাম নিয়ে ওরা চালিয়ে যাচ্ছে আক্রমণ, চালিয়ে যাচ্ছে বিচার, বিচারের কালেও নিচ্ছে ওঁরই নাম। 'তিনি' তো স্বৈরিণীকেও মৃদুকণ্ঠে বলে গিয়েছিলেন: 'তোমাকেও আমি দোষ দিই না!' কিন্তু তাতে কি? আজ দোষের হাত থেকে নিস্তার নেই কারো। ঈশ্বরের নামে বলছি, এই তোমার প্রাপ্য! ঈশ্বর? আমার সেই বন্ধু এতদূর তো প্রত্যাশা করেন নি। 'তিনি' শুধু চেয়েছিলেন ভালবাসা পেতে; তার বেশী কিছু চান নি। সান্ত্বনার কথা, এখনো, অনেক খৃষ্টান পর্যন্ত তাঁকে ভালবাসে। কিন্তু, তারা মুষ্টিমেয়। এ-ও তিনি বহুকাল আগেই ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে গিয়েছেন। ভারি রসিকও ছিলেন কিনা। জানেন তো, পিটার, কাপুরুষ সেই পিটার, ওঁর কথা উড়িয়ে দিয়েছিল: 'আমি তো তাকে চিনি না···আমি জানি না কি তুমি বলছ···' ইত্যাদি। আদতে, পিটারের বড় বাড় বেড়ে গিয়েছিল! তাই আমার বন্ধু কথার ওপর কথার চেক্‌নাই দিয়ে বলেছিলেন: 'তুমি

হচ্ছ পিটার * —তোমার ওপরই আমি ভিত্ গাঁথব আমার গীর্জার।' এর বাড়া রসিকতা আর আছে? বলুন? কিন্তু, তবু আজো ওদেরই জয়-জয়কার! 'জান তো, উনিই এ কথা বলেছেন!' উনি যে বলেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই; প্রশ্নটি তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল। তারপরও তিনি ওদের ছেড়ে চিরতরে চলে যেতে পারলেন, ওদের ফেলে রেখে গেলেন অন্যের সমালোচনা আর নিন্দা করবার শাপ দিয়ে, তাই ওদের মুখে ক্ষমার বুলি, মনে প্রাণদণ্ড দেবার বাসনা! /

তবে এযুগে যে দয়ার লেশমাত্র নেই, এমন কথা বলা চলে না; ভগবানের দিব্যি, কথায়-কথায় তো আমরা দয়ার প্রসঙ্গই তুলি। আদত বক্তব্য আমার, এ-যুগে কারো আর নিস্তার নেই। নির্দোষিতার মৃতদেহের ওপর কিলবিল করে বেড়াচ্ছে সর্বপ্রকার বিচারকেরা, খ্রীস্ট-পন্থী, খ্রীস্ট-বিপন্থী—সবাই এক-গোয়ালেরই গরু, সবাই ঢিট্ হবে 'সুখ নেই'-এর লৌহ-কপাটের আড়ালে। কারণ, কেবলমাত্র খ্রীস্টানদেরই সবকিছু দোষণীয়, এমন নয়। অন্যেরাও এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট। এই নগরীর যে বাড়িতে দেকার্ত্ কিছুকাল ছিলেন, সে বাড়িটার কি দশা এখন, জানেন? সেটা এখন পরিণত হয়েছে পাগলা-গারদে। সর্বত্রই এখন চলেছে দারুণ প্রলাপ, আর নিগ্রহের প্রকোপ। আমাদেরও একদিন ধীরে ধীরে গিয়ে ওই পর্যায়ে উপস্থিত হতে হবে। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন এতক্ষণে, যে আমি সবদিকেই সমান ঝোঁক দিয়ে থাকি। আর, আমি জানি, আপনিও আমার মতই। অতএব, আমরা সবাই যখন পরস্পরের সমালোচক, পরস্পরের কাছে আমরা সকলেই অপরাধী, প্রত্যেকেই আমরা এক-একজন সস্তাদরের যীশুখ্রীস্ট, নিজেদের অজ্ঞাতে প্রত্যেকেই আমরা একের পর এক ক্রুশবিদ্ধ হয়ে চলেছি। অন্তত আমাদের তা হওয়া একান্তই প্রয়োজন ছিল, যদি আমি, ক্লামাঁস, খুঁজে না-পেতাম এর একমাত্র সমাধান, রেহাইয়ের পথ, সত্যের সন্ধান।…,

* পিটার—পাথর (গ্রীক ভাষায়).

না, বন্ধু, এবার আমি মুখ বুঁজছি, ভয় নেই। এবার আপনার কাছে বিদায় নেব, কারণ আমার বাড়ির দোরে পৌঁছে গেছি। নিঃসঙ্গ অবস্থায়, বিশেষত দারুণ ক্লান্তির মাঝে, নিজেকে একজন অবতার স্বরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সবকথা বলা হয়ে গেলে, করা হয়ে গেলে সকল কাজ, মানুষ এসে পৌঁছয় আমার দশায়, এই আমি যেমন আশ্রয় নিয়েছি প্রস্তরাকীর্ণ, কুয়াসাচ্ছন্ন, এঁদো ডোবায় ভরা পাণ্ডববর্জিত এই মরুদেশে,—ঘৃণ্যযুগের বিফল বিভূতি, জ্বরাক্রান্ত, সুরাসক্ত আমি, ছাৎলা-ধরা দরজায় ঠেসান দিয়ে ভীষণ এক আকাশের দিকে তর্জনী তুলে বর্ষণ করে চলেছি তুমুল অভিসম্পাত—অধার্মিক মানব জাতির উদ্দেশ্যে। কোনরকম সমালোচনার ঝক্কি সইবার মত এদের সামর্থ্য নেই। ওরা তা সহ্য করতে অপারগ, বন্ধুবর, সে-ই হল আসল সমস্যা। ধর্মই যার একমাত্র সম্বল, তার মনে তিলেক ভয় থাকে না যদি বিচারের জোরে তাকে তার বিশ্বাস-অনুযায়ী কোন সম্প্রদায়ভুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষের ভয়ালতম উদ্বেগ হচ্ছে বিনা-বিচারে কোনও দণ্ডাদেশ মেনে নেওয়া। তবু সে উদ্বেগের হাত থেকে আমাদের রেহাই নেই। স্বাভাবিক রাশ আজ খুলে যাওয়ার দরুন, বিচারকেরা আজ দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছে কর্তব্যের জোয়াল কাঁধে। কাজেই, আমাদের উচিত—ওদের চেয়েও জোরে ছোটা। তাই না? সবটাই যেন এক পাগলা গারদের রূপ নিয়েছে। ছোটখাট অবতার আর হাতুড়ে ভূঁইফোড়ে চারিদিক ছেয়ে গেছে; তারা অনবরত নতুন নতুন ধর্মের নিখুঁত সঙ্ঘের লোভ দেখাচ্ছে মানুষকে—বিশ্বজগৎ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবার আগে, যতটা পারে, করে যেতে চাইছে। এই দুর্বিপাকের মাঝে, ভাগ্যক্রমে, সম্ভব হলো আমার আবির্ভাব! আমিই অন্ত, আমিই আদি। আমিই প্রবর্তক সকল ধর্মের। মোদ্দা কথা, আমিই হচ্ছি অনুতপ্ত বিচারক।

বটেই তো, বটেই তো, কাল আমি আপনাকে বলব আমার

আসল কাজটা কি। পরশু আপনি চলে যাচ্ছেন, কাজেই চটপট সবকথা সেরে নেব'খন। এখানেই কাল চলে আসুন; আসবেন তো? তিনবার বাইরে থেকে বেল্ বাজাবেন। আপনি কি ফিরে প্যারিসে যাচ্ছেন? বহুদূর, বহুদূর আজ প্যারিস; ভারি সুন্দর, প্যারিস; না, তাকে আমি ভুলতে পারি নি। মোটামুটি এই ঋতু-নাগাদ তার অপূর্ব সান্ধ্য-সৌন্দর্যের কথা ভুলি নি আমি। শুকনো, শিরশিরে সন্ধ্যা নামে ধোঁয়ায়-নীল বাড়ির ছাদে-ছাদে, নির্ঘোষ জাগে তামাম নগরীতে, নদীটা মনে হয় উল্টো পথে উজান বইছে। ঠিক এমনি লগনে আমি ঘুরে বেড়াতাম পথে-পথে। আজো তেমনিভাবেই ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি জানি! ভান দেখাচ্ছে, তারা ফিরে চলেছে ঘরে, ক্লান্ত অর্ধাঙ্গিনীর কাছে।···হায়, বন্ধু, জানেন না তো, বিরাট নগরীর বুকে নিঃসঙ্গ পথ চলার দুর্বিষহ ব্যথা!···

## ছয়

আপনি এসেছেন, তবু আমার বিছানা থেকে ওঠবার ক্ষমতা নেই, ভারি অস্বস্তি লাগছে। তেমন কিছুই না ; সামান্য একটু জ্বর, নিজেই চিকিৎসা করছি কষে 'জিন্' পান্ করে। এ জ্বর আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। যখন আমি পোপ্ ছিলাম, সেই সময় না জানি কেমন করে হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় ধরে। না, না, প্রায় ঠাট্টাই করছিলাম। জানি, আপনি কি ভাবছেন ; আমি যা-কিছু বলি, তার কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যা—ভেবে পাওয়া ভার। স্বীকার করছি, আপনার অনুমান ঠিকই। আমি নিজেও···জানেন, আমার পরিচিত একজন ছিলেন যিনি মানুষকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন : একদল, যারা লুকানোর মত এমন কিছুই করে না, মিথ্যা বলবার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ; আর একদল, মিথ্যা বলাই শ্রেয় মনে করে ঢেকে রাখবার মত কাজ না করবার চেয়ে ; আর তৃতীয় দল, যারা গোপনীয় কাজও করতে ভালবাসে, মিথ্যাকথাও বলতে তেমনি ভালবাসে। এর থেকে বেছে নিন, আমি কোন্ দলে পড়ি।

কিন্তু তাতে আমার ভারি বয়েই গেল। মিথ্যা বলতে বলতেই কি একদিন মানুষ সত্যে পৌঁছে যাবে না ? আর আমি এত যে কাহিনী বলি, সত্য হোক, মিথ্যা হোক, সর্বদাই তারা একই সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হয় না কি ? তাদের অর্থও কি অবিচ্ছিন্ন নয় ? কাজেই সত্যই বা কি, মিথ্যাই বা কি ? আমি যা ; আমি যা ছিলাম —তার মর্মটুকু যতক্ষণ ব্যক্ত করতে পারছি, ততক্ষণ আর কিসের আমি পরোয়া করি ? 'এক-একসময় সত্যবাদীর চেয়ে মিথ্যাবাদীর মনের কথা বেশী পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। আলোর মত সত্যেও

চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু মিথ্যা হচ্ছে সুন্দর গোধূলির আলো যেখানে সবকিছুই পায় তার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব। যাক-গিয়ে, বিশ্বাস করুন, একসময় জেলে আমি পরিচিত ছিলাম পোপ্ নামে।

বসুন, দোহাই আপনার। ঘরটা আপনি খুঁটিয়েই দেখছেন। নিরাভরণ, তবু, ছিমছাম। একটা মাত্র ভারমিয়ার, কোন আসবাব-পত্র নেই, নেই কোন তামার পাত্র। বই-টইও নেই, কারণ বেশ কিছুকাল হলো আমি বই পড়া ছেড়ে দিয়েছি। এককালে আমার বাড়িতে আধ পড়া বইয়ের ছড়াছড়ি ছিল; মেদ-সম্পৃক্ত মেটুলির খানিকটা কেটে নিয়ে বাকিটা ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতই বিরক্তিকর ও-ব্যাপারটা। আর যাই হোক, এখন আমি একমাত্র যা ভালবাসি —তা হলো স্বগতোক্তি করতে, আর বিখ্যাত যে সব লেখকেরা স্বগতোক্তি লেখেন, তাঁরা স্বগতোক্তি এড়াতে চান বলেই ও-সব তাঁরা লেখেন, যা তাঁরা সত্যিই জানেন, সে-সব কথা আদৌ ওঁরা লেখেন না। যখন তাঁরা যন্ত্রণাদায়ক স্বীকারোক্তি করছেন বলেন, তখনই চোখ কান খুলে রাখা দরকার, কারণ তখনই তাঁরা শাক দিয়ে চেষ্টা করেন মাছ ঢাকতে। বিশ্বাস করুন, যা বলছি তা সত্যি। কাজেই ও প্রসঙ্গের এবার ইতি। আর আমি বইয়ের ধার ধারি না, আর আজে বাজে ফালতু জিনিসের মোহে বাঁধা পড়ি না আমি; স্রেফ যেটুকু না-হলে নয়, সেটুকুই রাখি, ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে যেন কফিন। তা ছাড়া এই ওলন্দাজ বিছানাগুলো, এমন শক্ত অথচ তার চাদরটা এত পরিষ্কার যে এমন বিছানায় শুলে মরণটা মনে হয় অতি পবিত্র, পরিচ্ছন্ন!

আমার পোপ্ থাকাকালীন জীবনের কথা আপনি শুনতে চান বুঝি? অসাধারণ কিছুই নয়, সত্যি বলতে কি! খোলাখুলি বলতে পারব না ভেবেছেন? হ্যাঁ, জ্বরটা এবার ছাড়ছে। সে বহুকাল আগের কথা। ঘটনাটা আফ্রিকায় ঘটেছিল, যেখানে মিস্টার রমেল্ নামের এক ভদ্রলোকের চেষ্টায় যুদ্ধ বেধেছিল তখন। আমি সে যুদ্ধে

অংশ গ্রহণ করি নি, ভয় নেই। ইতিপূর্বেই ইউরোপের মহাযুদ্ধটাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিলেও সামনা সামনি লড়াই আমায় দেখতে হয় নি। একদিক দিয়ে, কথাটা ভেবে আমার এখন আফশোষই হয়। হয়তো, তা না হলে, অনেক পরিবর্তনই ঘটত! ফরাসী সৈন্যবাহিনী আমায় ফ্রন্টে পাঠানোর প্রয়োজন বোধ করে নি। আহ্বান জানিয়েছিল—পালিয়ে যাবার সময়। অনতিকাল বাদেই প্যারিসে ফিরে গেলাম, পড়লাম জার্মানদের খপ্পরে। যে মুহূর্তে আমার নিজেকে দেশপ্রেমিক বলে মনে হলো, তখনি আমি আকৃষ্ট হলাম বহু-কথিত বাম-পন্থীদের দিকে। হাসছেন আপনি? ভুল বুঝেছেন। মেট্রোয় চড়ে যাবার পথে, শাৎলে স্টেশনে আমি আবিষ্কারটা করি। গোলক-ধাঁধার মধ্যে একটা কুকুর ঢুকে পড়েছিল ভুল করে। বিরাট তার চেহারা, গায়ে খোঁচা খোঁচা লোম, একটা কান দুমড়নো, জ্বল্‌জ্বলে চোখ, গুঁড়িগুঁড়ি মেরে বেটা যাত্রীদের পা শুঁকে বেড়াচ্ছিল। আমার অনেকদিনের পুরনো এক বিশ্বস্ত কুকুর-প্রেম মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। 'কুকুর আমি ভালবাসি কারণ তারা জানে ক্ষমা করতে। এ কুকুরটাকে আমি ডাক দিতেই একটু দ্বিধা করে শেষটায় লেজ নাড়তে নাড়তে এসে দাঁড়াল আমার কয়েক গজ দূরেই। সেই মুহূর্তেই এক তরুণ জার্মান সৈনিক আমার পাশ দিয়ে ডগমগ করতে করতে চলে গেল। কুকুরটার কাছে গিয়ে তার নোংরা মাথাটায় একটু আদরও করল লোকটা। অমনি বিনা দ্বিধায় কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে চলল জার্মানটার পায়ে পায়ে। বেটা জার্মানের বিরুদ্ধে চড়াৎ করে আমার মাথায় যে আক্রোশ চেপে গেল, তা থেকেই বুঝলাম, আমি স্বদেশ-প্রেমী। যদি কোন ফরাসী নাগরিকের পিছু নিত কুকুরটা আমার বিন্দুমাত্র চোখেও পড়ত না। কিন্তু যে ক্ষণে আমার মনে হলো, ওই কুকুরটা জার্মান রেজিমেন্টের ভাগ্যলক্ষ্মী, রাগে আমার সর্বাঙ্গ গশ গশ্ করতে লাগল। এ থেকেই আমার বিশ্বাসটা বদ্ধমূল হলো।

সাদার্ণ জোন্-এ গিয়ে আমি হাজির হলাম বাম-পন্থীদের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশদ জানব বলে। কিন্তু, সেখানে পৌঁছে, সব কথা জানতে পেরে আমি দ্বিধান্বিত হলাম। ওদের হাবভাব আমার কাছে বাতুলতা মনে হলো। আমার স্বভাবই হচ্ছে খোলা মেলা ; গুপ্ত সমিতির কাজ-কর্ম আমার ধাতেও সইবে না, রুচিতেও না। আমার মনে হলো, ওরা যেন একটা খুপরিতে আমায় বসিয়ে উপদেশ দিচ্ছে তাঁত বুনতে ; দিন নেই, রাত নেই, তাঁত বুনেই চলেছি, এমন সময় কোন গুপ্তস্থান থেকে একদল বর্বর এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, আমার সব বোনা-টোনা খুলে ফেলবে, তারপর, অন্য একটা কুঠরীতে নিয়ে গিয়ে আমায় উত্তম মধ্যম দিতে দিতে জান লবেজান করে দেবে! এমন গোপন বীরত্বের গুরুভার যারা বহন করতে সমর্থ, তাদের আমি সমীহ করে চললেও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে অপারগ।

কাজেই আমি সাগর পেরিয়ে হাজির হলাম উত্তর আফ্রিকায়, লণ্ডন-মুখো পাড়ি জমাবার একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে। কিন্তু আফ্রিকার পরিস্থিতি তখন ভারি ঘোলাটে ; প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলেরই দাবী ন্যায়সঙ্গত মনে হলো আমার, সুতরাং আমি নিলাম দর্শকের ভূমিকা। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, অনেক ঘটনা বাদ দিয়ে খুবই তাড়াতাড়ি যেন আমি কাহিনীটা বলে চলেছি, বাদ দিয়ে যাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ কতক-কতক অংশ। তা করছি, কারণ সেগুলোর দিকে আপনি সহজেই বেশী নজর দেবার মত বুদ্ধি ধরেন বলেই। যাই-হোক, আমি গিয়ে তিউনিশিয়ায় পৌঁছোলাম, যেখানে আমার এক গুণগ্রাহী বান্ধবী আমায় একটা কাজ জুটিয়ে দিল। ফিল্মের কারবারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বুদ্ধিমতী এই বান্ধবীটি। তিউনিশ-অবধি তার সাথে আমি গেলাম ; কিন্তু তার আসল কাজ আমি বুঝতে পারলাম না, যতদিন না আমাদের মিত্রশক্তিরা অবতরণ করলেন আলজিরিয়ায়। বান্ধবীটি জার্মানদের হাতে বন্দী হলেন ; আমিও ;

কোন কারণ না জেনেই। বান্ধবীর কি হলো তারপর, জানতে পারি নি। আমার কোন ক্ষতি করা হলো না, বেশ-খানিক ত্যক্ত-বিরক্ত হবার পর উপলব্ধি করলাম, নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই আমায় বন্দী করা হয়েছিল। ত্রিপলী-র কাছাকাছি একটি বন্দীশিবিরে আমায় রাখা হয়েছিল যেখানে শারীরিক অত্যাচারের চেয়ে তৃষ্ণায় এবং অনটনেই আমরা কষ্ট পেয়েছি বেশী। সে বর্ণনা আপনার কাছে আমি করব না। এই শতাব্দীর অর্ধভাগের ছেলে আমরা, মানচিত্র না এঁকে দিলেও আমাদের ও সব জায়গার মহিমা বুঝে নিতে দেরি হয় না। দেড়শ বছর আগে হ্রদ, বন ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষের আবেগপ্রবণতার অন্ত ছিল না। আজ, আমাদের জীবনের একমাত্র কাব্য হলো বন্দী-শিবির। কাজেই, আপনার কল্পনাশক্তির হাতেই ওটুকু ভার আমি ন্যস্ত করলাম। তার সাথে আরো কয়েকটা আঁচড় কেটে যদি নেন, ব্যস! ধরুন, সেখানকার গরম, মাথার ওপরের জ্বলন্ত-সূর্য, মাছির রাশ, বালি, জলশূন্যতা ইত্যাদি!

আমার সঙ্গে ছিল তরুণ একটি ফরাসী; মনে তার অটুট বিশ্বাস! যা বলছি, শুনতে নির্ঘাৎ রূপকথার মতই লাগবে! ছেলেটি আচারে-ব্যবহারে একদম পাক্কা তুগেস্ ক্ল্যঁ্যা। ফ্রান্সের চৌহদ্দি ছেড়ে সে স্পেনে গিয়ে হাজির হয়েছিল, যুদ্ধে যোগ দেবে বলে। বেচারাকে ক্যাথলিক জেনারেল-সাহেব বন্দী করে ফেললেন, আর ফ্র্যাঙ্কো ক্যাম্পে রোমের আশীর্বাদ-পুষ্ট মোরগ-দানার স্বরূপ দেখে বেচারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ল। পরে গিয়ে যখন আফ্রিকায় ও হাজির হলো, সে দেশের আকাশ কিংবা ক্যাম্পের প্রচুর অবসর—কোনকিছুই ওর মনের সে-হতাশা কাটাতে পারল না। অনবরত ভেবে ভেবে, আর ওদেশের রোদের প্রভাবে বেচারা একটু বিচলিতই হয়ে উঠেছিল। একদিন, আমরা তাঁবুর তলায় বসে যখন জনা-দশেক মিলে খাবি খাচ্ছি একঝাঁক মাছি আর তপ্ত-সীসে ঝরানো গরমে, তখন রোমান জেনারেলের মুণ্ডপাত করছিল ছেলেটা। সপ্তাহখানেক না

কামানোর দরুন একমুখ দাড়ি গজিয়েছিল ওর মুখে; কেমন বন্য দৃষ্টিতে ও আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। কোমর অবধি আদুড়-গা, ঘামে সপ্ সপ্ করছে; নির্বিকার চিত্তে ও পাখোয়াজের বোল তুলে চলেছে তার অতি-স্পষ্ট পাঁজরার ওপর গুমাগুম্ কিল মেরে। ও হঠাৎ ঘোষণা করল যে সিংহাসনারূঢ় প্রার্থনারত পোপের বদলে অবিলম্বে নতুন একজন পোপ চাই যিনি আমাদের মত হতভাগার চিরসাথী হয়েই দিন কাটাতে রাজী। মাথা দোলাতে দোলাতে সে তেমনি বন্য-দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রইল। 'হুঁ' ও আবার বলল, 'যতশীঘ্র সম্ভব, নতুন এক পোপের দরকার!'. হঠাৎ খুব শান্ত গলায় ও বলল, আমাদেরই উচিত, এখুনি, ভালোয় মন্দে গড়া একজনকে নিজেদের মধ্যে থেকেই পোপ বলে নির্বাচিত করা, চাই একজন গোটা-মানুষ; তাকেই আমাদের সমস্ত বিশ্বাসের আসনে অধিষ্ঠিত করব, একমাত্র সর্তে—সে আমাদের এই ক্লিষ্ট দলটির সমস্ত দুঃখ নিজের মাঝে, আর দশজনের মাঝে জীইয়ে রেখে উপভোগ করবে। 'আমাদের মধ্যে', ও জানতে চাইল, 'সবচেয়ে পাপী কে?' ঠাট্টার খাতিরে আমিই হাত তুললাম, একমাত্র আমিই। 'বহুৎ আচ্ছা! জঁা-বাপ্তিস্ত্‌কে দিয়েই কাজ চলে যাবে!'—না, ঠিক হুবহু ও-কথা বলে নি, কারণ তখন আমার নাম ছিল অন্য-একটা। নিজেকে এভাবে খাড়া করতে যে পারে, ও বলল, তার নিশ্চয়ই মহৎ গুণেরো অভাব নেই। সুতরাং আমাকেই নির্বাচিত করা সাব্যস্ত হলো। সবাই, মজা পেয়ে, গম্ভীর মুখেই ওর কথায় সায় দিল। আদতে, দুগেসক্ল্যাঁকে আমরা ভালবেসে ফেলেছিলাম সকলেই। আমার আজ এমনও মনে হচ্ছে যে সেদিন হয়তো সবটাই আমি তামাসার খাতিরে করি নি। প্রথমত, আমি বুঝেছিলাম যে ছোকরার মনে সর্বোচ্চ সত্যের উদ্ভাস খানিকটা জেগেছিল। কিন্তু ওই দারুণ রোদে, অমানুষিক পরিশ্রমে, জলের সন্ধানে আকুল হয়ে আমাদের মনের অবস্থা খুব চড়া সুরে বাঁধা ছিল না। যাই-হোক আমার পোপ-পদে

বেশ কয়েক সপ্তাহ আমি বহাল রইলাম অটল গাম্ভীর্যের সাথে।

আমার কাজ কি ছিল? আমাদের বন্দীশালার একাংশের নেতা, কিংবা সেক্রেটারী বলতে পারেন। অন্যেরা, আমায় করুক চাই না করুক, ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠল আমায় মান্য করতে। ত্বগেস্ক্রঁ্যা দেখলাম বড় কষ্ট পাচ্ছে; আমার পৌরোহিত্যে তার যন্ত্রণা লাঘবের অনুষ্ঠান সাধিত হলো। আমি আবিষ্কার করে বসলাম, পোপ্ হওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। কথাটা আমার গতকাল মনে পড়ে গেল যখন আমার সহকর্মী—বিচারকদের—আমি মুণ্ডপাত করছিলাম। আমাদের ক্যাম্পের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল জলের ভাগ-বাঁটোয়ারা। রাজনীতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত দলগুলি চেষ্টা করত নিজের নিজের কমরেডের স্বাচ্ছন্দ্যটুকুই দেখে চলতে। ফলে, আমিও আমার অনুগতদের স্বাচ্ছন্দ্য দেখতে সুরু করলাম। এই হলো সূত্রপাত। তবু, তাদের মধ্যে সকলকেই সমান চোখে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। তাদের অবস্থা এবং কাজের প্রকার অনুযায়ীই একজনকে হয়তো অন্যজনের চেয়ে বেশী খাতির করতে ভাল লাগত। এমন সামান্য পার্থক্যই অনেক সময় ফল প্রসব করে পর্বত প্রমাণ। কিন্তু আমার ভারি ক্লান্তি লাগছে; ও-সব দিনের কথা আর ভাবতে মন চাইছে না। আমার যাজকত্ব শেষ হলো সেদিন, যেদিন মরণাপন্ন এক কমরেডের মুখ থেকে জল ছিনিয়ে খেয়ে নিলাম আমি। না, না, ত্বগেস্ক্রঁ্যার মুখের জল নয়; সে বোধহয় তার ঢের আগেই পটল তুলেছিল, তার কারণ নিজের উপর সে অত্যধিক অত্যাচার করত। তা ছাড়া, ও যদি বেঁচেই থাকত, তবে আমি হয়তো অমন স্বার্থপরতা চট্ করে করে ফেলতে পারতাম না, কারণ আমি ভালবাসতাম ওকে—হ্যাঁ, ভালবাসতাম বই-কি, অন্তত এখন আমার ওই রকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু নাভিশ্বাস-ওঠা কমরেডের মুখের জল যে আমি কেড়ে খেয়েছিলাম, তা নিঃসন্দেহ। মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম, আমাকে অন্যদের অনেক বেশী প্রয়োজন ওই

মুমূর্ষু লোকটার চেয়ে ; অন্যদের প্রতি আমার তো একটা কর্তব্য আছে! এভাবেই, বুঝলেন বন্ধুবর, মৃত্যু-সূর্যের আওতায় গজিয়ে ওঠে যত সাম্রাজ্য আর গীর্জা। আর কাল যা আপনাকে বলেছি, তার আংশিক সংশোধনের উদ্দেশ্যে আজ একটা জিনিস আপনাকে বলব ভাবছি, এখনই কথাটা আমার মনে এল। যে সত্যটা আপনাকে বলব, তা আমার স্বপ্ন-লব্ধই, নাকি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত, সেকথা আজ আর ঠিক মনে নেই। আমার কথাটা হচ্ছে এই, পোপকে আমাদের সবারই উচিত ক্ষমা করা। প্রথমত, উনি অন্য যে কোন লোকের চেয়ে বেশী করে আমাদের ক্ষমার মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয়ত, এ পথে ছাড়া অন্য কোন উপায় তো দেখি না—ওঁর ওপর যার সাহায্যে টেক্কা মারা চলে।

আচ্ছা, দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে এসেছেন তো? এসেছেন? দোহাই, একবার উঠে একটু দেখে নিন। আমার ঐ দরজা বন্ধ রাখা বাতিক আছে ; মাফ করবেন। ঠিক ঘুমুতে যাবার আগের মুহূর্তে আমার আর মনে পড়ে না খিলটা দিয়েছি কিনা। কাজেই, রোজ রাতে আমায় বিছানা ছেড়ে উঠে দেখতে হয় ; নয়তো মন মানে না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, কোন ব্যাপারে মানুষ কখনো নিশ্চিত হতে পারে না। ভীত গৃহস্বামীর মনোবিকার বলে যেন আমার এই দরজা বন্ধ রাখা বাতিককে অভিহিত করবেন না। সেকালে কোনদিন আমি বাড়ি কিংবা আমার মোটরের দরজায় তালা দিতাম না। টাকা-কড়ি ভুলেও তালা দিয়ে রাখতাম না ; আমার যা কিছু ছিল, কোনকিছুতেই তেমন আকর্ষণ বা মমতা আমার ছিল না। সত্যি বলতে কি, কোনকিছু থাকাটাই আমার কাছে লজ্জাকর ঠেকত। প্রায়ই কি আমি কথায় কথায় সর্বান্তঃ-করণে বলে উঠতাম না: 'সম্পত্তি থাকা মানেই মশাই খুনের দায়!' হৃদয়ের এত প্রসারতা আমার ছিল না যে যোগ্য কোনও দরিদ্র ব্যক্তির সাথে ভাগাভাগি করে নিই আমার যথাসর্বস্ব। তাই আমি

চোরের নাগালের মাঝেই রেখে দিতাম সর্বস্ব, চাইতাম সব-অন্যায়ের সংশোধন করতে—দৈবের ওপর নির্ভর করে। আর আজ তো আমার নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। কাজেই নিজের নিরাপত্তার জন্য আমি তত উদ্বিগ্ন নই, যত আমার উদ্বেগ নিজের সম্বন্ধে এবং আমার করিৎকর্মা বুদ্ধির সম্বন্ধে। আর আমি উদ্বিগ্ন আমার ছোট্ট দুনিয়াটা সম্বন্ধে, যে দুনিয়ায় আমিই হচ্ছি রাজা, আমিই পোপ্, আমিই বিচারক।

ভাল কথা, একবার উঠে গিয়ে ওই আলমারিটা খুলবেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাই; দেখুন তো ওই ছবিখানা। দেখে চিনতে পারলেন না ছবিটা? এটাই তো সেই বিখ্যাত 'ন্যায় বিচারক'দের ছবি। সেকি, এখনো যে আপনি লাফিয়ে উঠলেন না? তবে কি আপনার শিক্ষার কোথাও ফাঁক থেকে গিয়েছে? যদি কাগজ পড়েন, তাও তো আপনার মনে থাকবার কথা, ১৯৩৪ সালে গেণ্ট্-এর সেই স্যাঁ-বাঙঁ কাতেদ্রাল থেকে চুরি হয়ে যাবার ঘটনা, ভ্যান্ ডাইকের আঁকা বিখ্যাত ছবি 'মেষের অর্চনা' থেকে একটা প্যানেল চুরি যাবার ঘটনা! সেই প্যানেলটার নামই তো 'ন্যায় বিচারক'। ছবিটায় দেখানো হয়েছে, বিচারকেরা ঘোড়ায় চেপে আসছেন পবিত্র সেই জীবের পূজা দিতে। কিন্তু মূল ছবিটা আর কোনমতে খুঁজে না পাবার দরুন তার বদলে চমৎকার একটি নকল ছবি গেণ্ট্-এর সেই গীর্জায় রেখে দেওয়া হয়েছে। এই তো সেই আসল ছবিটা। না, আমার কোন দরকার পড়ে নি। 'মেক্সিকো' হোটেলের এক খদ্দের—সেদিন সন্ধ্যায় দূর থেকে আপনি তাকে দেখেওছেন—একদিন সন্ধ্যায় নেশার ঘোরে এ-ছবিটা এক-বোতল মদের বদলে হোটেলওয়ালার কাছে বেচে দিয়েছিল। আমি প্রথমে হোটেল-ওয়ালা ওই গোরিলা বিশেষটিকে বলেছিলাম, ছবিটা বেশ বাহারদার কায়দায় দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দিতে; তাই, সারা জগত যখন তোলপাড় করে ফেলা হচ্ছিল ছবিটার সন্ধানে, তখন, বহুদিন যাবৎ,

'ন্যায় বিচারক'—কয়জন ভাল ছেলের মত আসন জাঁকিয়ে বসে থাকতেন এক-ঘর মাতালের মাথার ঠিক ওপরেই, দেয়ালের গায়ে। তারপর, আমার অনুরোধে, গোরিলা-বন্ধু ছবিটাকে আমার হেফাজতে এখানেই রেখে গিয়েছে। প্রথমে সে আমায় আমল দিতে চায় নি, কিন্তু সব-খবর শুনে সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে রাজী হয়ে গেল। সেদিন থেকে, স্বনামধন্য এই ম্যাজিস্ট্রেটরা আমার একমাত্র অনুচর হয়ে উঠলেন। 'মেক্সিকো' হোটেলের পানশালার ঠিক সামনেই দেয়ালটা কেমন ফাঁকা পড়ে আছে এঁদের অভাবে -- তা আপনি তো নিজে-চোখেই দেখেছেন।

প্যানেলটা আমি ফিরিয়ে দিলাম না কেন, এই তো? বটে? বটে? আপনার দেখছি পুলিশী মন, অত্যন্ত প্রখর! বেশ, আপনার পত্রের আমি জবাব দেব,' যে জবাব আমি স্টেট-এটর্নীর কাছেও দিতাম—যদি কোনদিন ছবিটা এখানে আছে, সে কথা জানাজানি হয়ে যায়। প্রথমত, এটি এখন আমার সম্পত্তি নয়, এটির স্বত্বাধিকারী হলো'মেক্সিকো'হোটেলের মালিক; এ ছবির ওপর যত দাবি গেণ্ট্-এর আর্কবিশপের, ততটা দাবিই এখন রাখে ওই হোটেল-ওয়ালা। দ্বিতীয়ত, যারা 'মেষের অর্চনা' দেখতে যায় রোজ সারি বেঁধে, তাদের কাছে আসল আর নকলের প্রভেদ আদৌ নেই; সুতরাং আমার কাছে আসলটা থাকার কোন বাধা দেখি না। তৃতীয়ত, এটা আমার কাছে থাকা আমারই গৌরবের কথা। মিথ্যা বিচারকদের প্রশংসায় মুখর যে ক্ষেত্রে সারা দুনিয়া, সে ক্ষেত্রে আমিই একমাত্র রাখি খাঁটি-মালের সন্ধান। চতুর্থত, এ ভাবে আমার হাতে একটা সুযোগ আছে যে কোন মুহূর্তে লৌহ-কপাটের অতিথি হবার —ভারি আরামপ্রদ সুযোগ পেয়ে গেছি। পঞ্চমত, যেহেতু ওই বিচারকেরা চলেছেন মেষের পূজায়—এবং দুনিয়ায় মেষ অর্থাৎ নির্দোষিতা বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব আর নেই যখন—এবং যেহেতু যে বুদ্ধিমান বদমাস এই প্যানেলটা চুরি করে এনেছিল, তার ভেতর

দিয়ে কাজ করেছেন অচেনা এক লোকাতীত ন্যায়ের শক্তি। যে মুহূর্তে ন্যায় একবার আলাদাই হয়ে গিয়েছে নির্দোষিতার থেকে— আর দ্বিতীয় জন স্থান পেয়েছেন ক্রুশের ওপর, প্রথমোক্তটি আমার আলমারিতে—তখন আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে যাবার পথ অবারিত। দিব্যি দরাজ অন্তরে এখন আমি আমার সুকঠিন পেশা, অনুতপ্ত বিচারকের পেশায় মন দিতে পেরেছি। বহু আশা পর্যুদস্ত হবার পর, বহু দ্বন্দ্বের শেষে আমি এ কাজে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পেরেছি। এখন, আপনি চলেই যখন যাবেন, সময় হয়েছে আমার পেশার স্বরূপ আপনার কাছে বর্ণনা করবার।

সবুর, আগে উঠে বসি ; তা নইলে দম আটকে আসছে। উঃ, কী দুর্বলটাই না হয়ে গিয়েছি! আপনার দোহাই, ওই বিচারকদের এবার ভালভাবে তালা বন্ধ করে ফেলুন। আর আপনাকে বলি নি, অনুতপ্ত বিচারকের কাজ? সে কাজই তো আমি করছি এখন। সাধারণত আমার আপিস হচ্ছে 'মেক্সিকো' হোটেলে। কিন্তু আসল কাজ চলে সে চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অনেকদূর। যতই বিছানায় শুয়ে জ্বরে নাকাল হইনা কেন, তখনো চলে আমার কাজ। আদতে এ কাজ করে- এমন সাধ্য কারো নেই ; এ আপনিই নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছে, নিঃশ্বাসের সাথে আপনি একেই তো গ্রহণ করছেন অনবরত। যেন ভেবে বসবেন না, এই পাঁচদিন আমি আপনার কাছে বকে চলেছি নিছক মজার খাতিরে। সে রকমটা অতীতে বহু করেছি : এখন আর নয়। এখন যা কিছু বলি, তার কিছু না কিছু উদ্দেশ্য আছে। তার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সেই অট্টহাসিকে ধামাচাপা দেওয়া, নিজেকে সমালোচনার হাত থেকে রেহাই দেওয়া, যদিও স্পষ্ট বুঝি, রেহাই মেলা অসম্ভব। আর রেহাই মেলা কঠিন কারণ আমরাই তো সর্বপ্রথম নিজেদের সমালোচনা করতে তৎপর হয়ে উঠি ; তাই না? কাজেই, আমাদের উচিত, সর্বপ্রথম অন্যদের মুণ্ডপাত নির্বিচারে করে গোড়া থেকেই হালকা করে নেওয়া মনটাকে।

/কারো কোন অজুহাতে কান দিলে চলবে না ; এই হলো আমার প্রথম অনুশাসন। মহৎ-উদ্দেশ্য, শ্রদ্ধেয় ভ্রান্তি, কাঁচামো, দোষ-লাঘবকারী পরিস্থিতি—এসব আমি মানতে রাজী নই। আমার কাছে মিলবে না অব্যাহতি বা আশিস। সবকিছু প্রমাণ জড়ো করে আমি খতিয়ে বলে দেবঃ 'এই হলো মোট পরিমাণ। তুমি হচ্ছ ধড়িবাজ, তুমি হচ্ছ নর-পাঁঠা, তুমি হচ্ছ আজন্ম মিথ্যুক, তুমি হচ্ছ 'হোমোসেক্সুয়াল', তুমি শিল্পী, ইত্যাদি!' ঠিক এইভাবেই বলব। এমনি করে, মুখের ওপরেই। দর্শনেই বলুন, রাজনীতিতেই বলুন, যত মত আর তত্ত্ব আছে তাদের মধ্যে আমি সায় দেব সেইসব মত আর তত্ত্বের স্বপক্ষে যারা মানুষকে নিরপরাধীর খেতাব দিতে নারাজ, আর আমি সেইসব রীতির স্বপক্ষে যারা মানুষকে পাপী ভেবে নিয়েই অগ্রসর হয়। আমায় দেখছেন, প্রিয়বর, আলোক-প্রাপ্ত এক উকীল আমি, দাসত্বের স্বপক্ষে।

সত্যি বলতে কি, দাসত্ব বিনা কোন সমাধানই মেলা ভার। এককালে আমি অষ্টপ্রহর স্বাধীনতার বুলিই কপচাতাম। প্রাত-রাশের সময় টোস্টের ওপর তারই প্রলেপ মাখিয়ে সারাটা দিন চর্বণ করতাম, আর, গুণগ্রাহীর সান্নিধ্যে আমার নিশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতার সৌরভে সুরভিত হয়ে উঠত। সেই বুলির সাহায্যেই আমি যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পর্যুদস্ত করতে পারতাম ; তারই সাহায্যে সিদ্ধ হতো আমার সকল কামনা, সকল ক্ষমতা-লিপ্সা। বিছানায় শুয়ে আমার শয্যাসঙ্গিনীদের কানে কানে এই বুলিই আওড়াতাম আমি, এরই সাহায্যে তাদের কবল থেকে উদ্ধারও পেতাম। এটা আমি বিশ্বময় প্রচার করে বেড়াতাম।...ধীরে, বন্ধু, ধীরে ; আমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়ছি ; কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আমার হারিয়ে যাচ্ছে। তবু, কালে-ভদ্রে আমি স্বাধীনতার বুলি কপচাতাম নিরাসক্ত অনেক ব্যাপারেও, এমন কি—হাসবেন হয়তো, আমার গেঁয়োমিতে—অনেক সময় স্বাধীনতার খাতিরে ঠিক মরতে না বসলেও অনেক বড় বড় ঝক্কি

মাথায় নিতে কসুর করতাম না। এমন বেপরোয়া স্বভাব আপনাদের ক্ষমাই পেতে পারে; জানতাম না আমি, কত ধানে কত চাল হয়! জানতাম না যে স্বাধীনতাটা কোন পুরস্কার বা সজ্জা বিশেষ নয়, যা তোফা উপভোগ করা চলে শ্যাম্পেন পান করতে করতে। এমন কোন যৌতুক বা মিঠাইয়ের বাক্সও নয় যে চোখ বুঁজে চেটে চেটে রসাস্বাদন করা চলে। জানতাম কি? স্বাধীনতা যে কপালের ঘাম পায়ে ফেলে অর্জিত ধন, দূর পাল্লার দৌড়ের সামিল, অত্যন্ত ব্যক্তিগত, কঠোর শ্রমসাধ্য ব্যাপার! শ্যাম্পেনের ঠাঁই নেই সেখানে, ঠাঁই নেই স্নেহমিশ্রিত বল্লভ-নয়নের। নিঃসঙ্গ, নিষিদ্ধ এক ঘবে, বিচারকদের সামনের কয়েদী-বেঞ্চে সম্পূর্ণ একা, একাই নিজেব মুখোমুখি কিংবা অপরের বিচারপ্রার্থী হয়ে নিজের ভাগ্য নিজে গড়া চাই! •সব স্বাধীনতার পরিণতি হচ্ছে আদালত থেকে পাওয়া দণ্ডাদেশ। তাই তো স্বাধীনতা অত গুরুত্ব পায় সর্বত্র, বিশেষত স্বাধীনতার গুরুভার বোঝা যায় যখন নির্জন ঘরে মানুষ মুহ্যমান দারুণ জ্বরের প্রকোপে, ভয়াল সঙ্কট-মুহূর্তে, যখন ভালবাসার কেউ নেই ধারে কাছে।

'মানুষের পক্ষে নির্জন, নিঃসঙ্গ, ভগবান বিহীন, প্রভু বিহীন জীবনেব চাপ যে কত ভয়ঙ্কর, আপনি জানেন না, বন্ধুবর। সেই জন্যেই মানুষের চাই একজন মনিব। আমাদের নীতিবাদী দার্শনিকদের কথাই ধরুন না; কত গম্ভীর তাঁরা, তাঁরা ভালবাসেন তাঁদের প্রতিবেশীদের, ভালবাসেন সবাইকেই—তাঁদের সাথে খ্রীস্টানদের বড় একটা প্রভেদ নেই, কেবল তাঁরা গীর্জায় ধর্মপ্রচার করতে যান না, এই যা। তবে কেন তাঁরা খ্রীস্ট-ধর্মে দীক্ষা নেন না, বলুন দেখি? কোথায় বাধে? বোধহয় সম্মানে বাধে, মানুষের প্রতি তাঁদের সম্মানে। হ্যাঁ, আত্মমর্যাদায়ও। বোঁ করে কোনও কেলেঙ্কারি তাঁরা ফেঁদে বসতে চান না বলেই তাঁরা আপন মনে মুখ বুজে থাকতেই ভালবাসেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, আমি এক নাস্তিক

ঔপন্যাসিককে জানি, যিনি রোজ রাতে প্রার্থনা করেন। তাতে কিছু এসে যায় নি তো : কি ঈশ্বর-বিদ্বেষ তাঁর প্রতিটি বইয়ে! পাঠকের ভাষায় বলতে গেলে—'কি ঝাড়ানটাই না ঝেড়েছে একহাত'! এ-কথা আমি যখন এক রণং দেহি মনোভাব-সম্পন্ন চিন্তাবিদ্‌কে বলি, তিনি—কোন রকম বদ্‌মতলব তাঁর ছিল না, আগে বলে রাখলাম—দুই হাত আকাশপানে তুলে বললেন : 'নতুন কথা শোনালে না, ওরা সবাই-ই ওই রকম!' তাঁর মতে, আমাদের লেখকদের শতকরা আশিজন, যদি বেনামী লিখতে পারতেন, তবে ভগবানের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়ে কলম ধরতে বসতেন দলে দলে। তিনি আরো বললেন যে লেখকেরা সকলেই স্বনামে লিখে থাকে, কারণ তারা নিজেদের ভালবাসে, কিন্তু কারো গুণগান ওরা গায় না কারণ নিজেদের তারা ঘৃণা করে। কাজেই, সর্বদা আত্ম-বিচার করবার হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে তারা শুরু করে নীতি প্রচার করতে। মোটের ওপর, ওদের যা কিছু শয়তানি—তা ধর্মসঙ্গত। বলিহারি এ যুগ! আজ যে সবার মনেই সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আমার এক বন্ধু নাস্তিক ছিল, যতকাল আদর্শ স্বামী হিসেবে সে বাস করতে পেরেছিল; তারপর সে গ্রহণ করল খ্রীস্টধর্ম—যখন থেকে শুরু হলো তার ব্যভিচারী জীবনের।

হায় রে, কতই বা মুরোদ এইসব ছোটখাট ইতর-মনা লোকগুলোর, অভিনেতাগুলোর, ভণ্ডগুলোর—তবু বড় মায়া লাগে! বিশ্বাস করুন, স্বর্গকে ওরা পুড়িয়ে রসাতলে নিক্ষেপ করতে যদি বসে, তা সত্ত্বেও ওদের ধর্মবুদ্ধি থাকবে টনটনে। তারা নাস্তিকই হোক, নিত্য গীর্জা-গামীই হোক, মস্কোবাসীই হোক, বস্টোনিয়ান-ই হোক, বাপ থেকে ব্যাটা-পরম্পরায় ওরা সবাই কিন্তু খ্রীস্টান! কিন্তু আদতে, ব্যাটাদের বাপেরও যেমন আর ঠিক-ঠিকানা নেই, তেমনি ঠিক-ঠিকানা নেই কোনরকম ধর্মের! তারা সবাই স্বাধীন এবং, সেই হেতুই, নিজের পথ নিজে বেছে নিতে চায়; কিন্তু স্বাধীনতা তারা চায় না, কোন

রকম সমালোচনাও চায় না বলেই তো তাদের কামনা—হাতের গাঁটে গাঁটে চলুক বেত্রাঘাত, আর তারা উদ্ভাবন করতে চায় ভয়ঙ্কর নতুন নতুন আইন, উন্মাদ হয়ে ছুটে যায় গীর্জার বদলে গড়ে তুলতে কাঠের স্তূপ। আপনাকে বলি নি?—সবাই সাভোনারোলা এক-একটি! তবে তাদের সমস্ত আস্থা পড়ে আছে পাপের দিকে, করুণার দিকে তাদের দৃষ্টি নেই। অষ্টপ্রহর তাদের ও-ই একমাত্র চিন্তা। তবু করুণাই তারা পেতে চায়—স্বীকৃতি, সমর্পণ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, চাই কি (তাদের আবেগের তো অন্ত নেই!) বাগদান, নিষ্পাপ সরলা বঁধু, দশাসই পুরুষ, অর্গ্যানের বাজনা,—কোন্‌টা বাদ থাকে? আমার কথাই ধরুন না (আর আবেগ-টাবেগের ধার আমি মোটেই ধারি না)—জানেন, কিসের স্বপ্ন আমি দেখতাম? আমি চাইতাম কায়মনোবাক্যে প্রকাশ-পাওয়া সম্পূর্ণ নিটোল এক প্রেম, কি দিনে, কি রাতে, নিরবচ্ছিন্ন এক আশ্লেষ, ইন্দ্রিয়ভোগ আর মানসিক উত্তেজনা—এইসব নিয়ে ধনে-পুত্রে দীর্ঘ পাঁচটি বছর উপভোগ করতে, আর তার শেষ যেন হয় মৃত্যুতে। হায় রে!

কাজেই, দেখছিল, বাগ্‌দানের পরিবর্তে, নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের অভাবে—আছে একমাত্র বিবাহ, পাশবিক বিবাহ, ক্ষমতা আর চাবুকের শাসন। একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, সবকিছু সহজ সরল করে তোলা, ছোট্ট ছেলের মত করে প্রতিটি কাজ শেখা দরকার অভিনিবেশ সহকারে, সুশৃঙ্খলভাবে, নির্দয়ভাবে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। আর আমার তো সর্বথাই সাতখুন মাপ; যতই আমি জাভানীস বা মিসিলিয়ান হই-না কেন, যতই আমি অখ্রীস্টান হই-না কেন, সর্বপ্রথম খ্রীস্টান যিনি হয়েছিলেন, তিনি আমার মনে আত্মার আত্মীয়। কিন্তু পারী নগরীর ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আমিও একদিন উপলব্ধি করলাম যে আমিও স্বাধীনতাকে ভয় করি। কাজেই ধন্য, ধন্য সেই মনিব, যে বিধিদত্ত ধর্মের উচ্ছেদ করে প্রবর্তন করে স্বকীয়তার। 'আমাদের

পরম-পিতা, যিনি ক্ষণিক তরে উপস্থিত···আমাদের কর্ণধার, আমাদের ভয়ঙ্কর কঠোর মনিব, হে নির্মম অথচ প্রেমাস্পদ নায়ক!···' মোট কথা, আসলে আমরা সকলেই চাই স্বাধীনতার বালাই চুকিয়ে ফেলতে, চাই অন্যের বশ্যতা মেনে নিতে, অনুতাপের খাতিরে, যে জন আমাদের চেয়েও বেশী শয়তান, তারই বশ্যতা। যেদিন আমরা পুরোদস্তুর পাপী বনে যাব, সেদিনই তো সূচিত হবে আসল গণতন্ত্রের। অবশ্য এ-কথা ভুললে চলবে না, বন্ধুবর, যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে মরতে হবে—তার প্রতিশোধ আমরা তুলবই তুলব। মৃত্যু হলো একক, যেক্ষেত্রে দাসত্ব হচ্ছে যৌথ। আমাদের সাথে-সাথেই অন্যদেরও ভাগ্যে একই ফল ফলছে, সেই তো একমাত্র সান্ত্বনা। সবাই আমরা একত্রে আছি তো,—সে যতই আমাদের নতজানু হয়ে, মাথা হেঁট করে থাকতে হোক!

কি চমৎকার লাগে বলুন তো—দুনিয়ার ঠিক আর দশজনের মতই মামুলি জীবন যাপন করতে? আর সেই চমৎকারিত্বের স্বাদ যদি পেতে চাই, তবে দুনিয়ার আর দশজনকে যে আমার মতনটি করেই গড়ে উঠতে হয়! ভীতি প্রদর্শন, বেইজ্জৎ করা, পুলিশ এরাই হল সেই সাদৃশ্য যজ্ঞের মন্ত্র-স্বরূপ। ঘৃণা কুড়িয়ে, নির্যাতিত হয়ে, অধীনতার পাশে ন্যুব্জ হয়েই একমাত্র জেগে ওঠে আমার পূর্ণ বিক্রম, উপভোগ করতে পারি আমার সমস্ত অস্তিত্বটা, মনে করতে পারি নিজেকে স্বাভাবিক! সেজন্যই, বন্ধুবর, স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে আমার সসম্ভ্রম নতি জানানো শেষ হলে, আমি মনস্থির করে ফেললাম—সর্বপ্রথম যাকে পাব, তার হাতেই বিনা দ্বিধায় আমি সঁপে দেব আমার সকল স্বাধীনতা। কাজেই, যখনই সুযোগ পাই, আমার এই 'মেক্সিকো নগরী' হোটেলের যজ্ঞবেদীতে বসে আমি বিতরণ করি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সহৃদয় যাঁরা, তাঁদের আমি অনুরোধ করি ওপর-ওয়ালাদের বশ্যতা সর্বদা মেনে নিতে, মেনে নিতে নম্র চিত্তে,

দাসত্বের সমস্ত সুখ, তাকে আমি নিখাদ স্বাধীনতা বলে পর্যন্ত অভিহিত করতে প্রস্তুত।

তাই বলে আমি পাগল হয়ে যাই নি ; এটুকু জ্ঞান আমার আছে যে দাসত্বের অত চট্ করে প্রবর্তন করা চলে না। অনাগত দিনে যে তার প্রতিষ্ঠা হবে এবং মানুষ সুখী হবে, তা আমি ভালভাবেই জানি। ইতিমধ্যে আমায় ভাবতে হবে বর্তমানের কথা, আপাতত খুঁজে বার করতে হবে একটা সমাধান। অর্থাৎ কিনা খুঁজে বার করতে হবে এমন একটা উপায়, যাতে করে আমার একার ঘাড়ে না এসে বিচারের গুরুভারটা বিতরিত হয়ে যাবে সবার ওপর। খুঁজে পেলামও সেই উপায়। দোহাই, জানলাটা একটু খুলে দিন না ; উঃ, কী ভয়ানক গরম! বেশী খুলবেন না, আমার শীত-শীতও করছে যে। আমার আইডিয়াটা যেমন সোজা, তেমনি ফলপ্রসূ। কি করে দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে অপরাধের প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলে নিজে খোস মেজাজে তার আওতার বাইরে থাকতে পারা যায়, বলুন দেখি? সোজা যাজকের বেদীতে উঠে দাঁড়িয়ে গালি বর্ষণ শুরু করব তামাম মানবতার উদ্দেশ্যে? যেমনটি আমার অনেক সমসাময়িকই করে থাকেন? ভারি বিপজ্জনক, নয় কি? চকিতে, কবে কোনদিন, কোনও নির্জন রাতে হঠাৎ শোনা যেতে পারে অট্টহাসি। যে দণ্ডাদেশ আপনি জারি করছেন অন্যের ওপর, তা আপনারই মুখের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে শেষ পর্যন্ত, বেশ খানিক ক্ষতি না করে ছাড়বে না। অতএব, পথ কই? তাই জানতে চান? তা জানতেই তো প্রয়োজন অসামান্য প্রতিভার। আমি এই পথ বাৎলাতে পারি : যতক্ষণ না আমাদের মনিব তেড়ে আসছেন তাঁর ডাণ্ডা নিয়ে, আমরা ততক্ষণে, কোপার্নিকাসের মত, সব হিসেব উল্টে দিতে পারি বাজীমাৎ করবার জন্য। যেহেতু নিজের বিচার না করে অন্যের বিচার করা চলে না, তবে অন্যকে বিচার করেই নিজেকে বিমূঢ় করে তোলা চাই। যেহেতু সব বিচারকই একদিন না একদিন গভীর অনুতাপে আচ্ছন্ন

হয়ে পড়ে, তবে উল্টোপথেই তো যাত্রা শুরু করা উচিত, অর্থাৎ অনুতাপ করতে করতে শেষ অবধি উপস্থিত হওয়া বিচারকের পদে। বুঝেছেন ব্যাপারটা? তা বেশ। তবু, মনের কথা আরো পরিষ্কার করেই বলি আপনাকে।

প্রথমত আমি আমার ল-অফিসের দোরে কুলুপ এঁটে, পারী নগরী ত্যাগ করে, বেরিয়ে পড়লাম দেশ ভ্রমণে। ভেবেছিলাম, অন্য কোথাও অন্য কোন নামে আবার প্র্যাকটিস শুরু করে দেব। তেমন জায়গার অভাব দুনিয়ায় ছিল না; কিন্তু দৈবক্রমে, নিজেব সুবিধার্থে, নিয়তির পরিহাসে আর খানিকটা আত্ম-পীড়নের তাগিদে আমায় বেছে নিতে হল এই জল আর কুয়াসাচ্ছন্ন রাজধানী, যার চতুর্দিকে ক্যানালের ছড়াছড়ি, অত্যন্ত জনবহুল যার পথ-ঘাট, যেখানে হরদম পৃথিবীর সর্বকোণ থেকে আনাগোনা করছে নতুন নতুন লোক। নাবিক' পাড়ার এক পানশালায় আমি গিয়ে অফিস বসালাম। বিচিত্র রকমের খদ্দের আসতে লাগল। গরীবেরা তো আর অভিজাত কোন অঞ্চলে যাবে না সাহায্যের মুখ চেয়ে, কিন্তু কুখ্যাত অঞ্চলে বিখ্যাত লোকদের নানা তাগিদের জোরে প্রায়ই আসতে হয়। তাই আমি ওৎ পেতে থাকি সেইসব বাবু-শ্রেণীর, বিশেষত বিপন্ন বাবু-শ্রেণীর খদ্দেরেব পথ চেয়ে। তাদের কাছ থেকেই সবচেয়ে মনোমত ফল পাওয়া যায়। তোখোড় ওস্তাদ যেমন দুষ্প্রাপ্য বেহালার বুকে ছড় টানে, তেমনি আমিও আদায় করে নিই ওইসব খদ্দেরের কাছ থেকে সূক্ষ্মতম শব্দের ঐশ্বর্য।

এইভাবে, বেশ কিছুকাল আমার প্র্যাকটিস চলেছে এই 'মেক্সিকো নগরী' হোটেলে। প্রথমত আমার কাজ হল, যত ঘন ঘন সম্ভব জনগণের কাছে স্বীকারোক্তি করা। নিজেকে আপাদমস্তক আমি নিন্দায় নিন্দায় জর্জরিত করে তুলি। ব্যাপারটা আর কঠিন ঠেকে না এখন, কারণ স্মৃতিশক্তি আমার বেশ প্রখর হয়েই উঠেছে। কিন্তু, এ কথা জেনে রাখুন, আদিম পন্থার শরণ নিয়ে বুক চাপড়ে

আমি আত্মনিন্দা করি না আদৌ। না, আমার পন্থা অত্যন্ত নিপুণতা সাপেক্ষ, বহুরকম বৈশিষ্ট্য আর প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করে— শ্রোতার রুচি-মাফিক নিজেকে মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলি আমি পাতায়-পাতায়। দু-জনের মধ্যে যে সব অভিন্নতা আছে, সে-সবের শরণ নিয়ে, অভিন্ন অনেক অভিজ্ঞতার সাহায্যে, অনেক ভ্রান্তির অজুহাতে, আমি গড়ে তুলি এক ছবি যা সকলেরই, অথচ যার সাথে নেই কারো কোন সাদৃশ্য। অর্থাৎ, একটা মুখোসের আশ্রয় নেই, ঠিক মেলায় যেমন মুখোস দেখে, তার অবিকল রূপ দেখে লোকে বলে ঃ 'বাঃ, এ-লোকটিকে তো ইতিপূর্বে আমি কতবার দেখেছি!' ছবিটা যখন সাঙ্গ হয়, তখন, আজ সন্ধ্যার মতই, আমি তা তুলে ধরি গভীর খেদের সাথে, আর বলি, 'দুর্ভাগ্যক্রমে এই আমার স্বরূপ!' সরকারী উকিলের ভূমিকায় ছেদ পড়ে ওখানেই। তবু, যে ছবি আমি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরি, তা যে আমার সমসাময়িকদের সামনে দর্পণের মতই মনে হয়।

ভস্মাচ্ছাদিত, নখরঘাতে বিকৃত-বদন, আমি নিজের মাথার চুল-গুলোকে টেনে টেনে ছিঁড়তে থাকি, উঠে দাঁড়াই আমি তাবৎ মানবতার মুখোমুখি; আদ্যোপান্ত বিবৃত করে যাই আমার সমস্ত লজ্জাকর ইতিহাস, মুহূর্তেক-তরে কখনো বিস্মৃত হই না—কী উদ্দেশ্যে এই স্বগতোক্তি ; বলি আমি ঃ 'আমি ছিলাম নীচতম নীচ!' তারপর সুকৌশলে আমি 'আমি' থেকে চলে যাই 'আমরা'-য়। যখন আমি বলি, 'এই তো আমাদের স্বরূপ', তখনই আমার খেলা শেষ হয়, আমি সবাইকে ছুটি দিয়ে দিই। তাদের মতই আমিও ; আমরা সবাই এক গোয়ালেরই গরু। তবু ওদের চেয়ে নিজেকে আমার শ্রেষ্ঠতর মনে হয় কারণ, এ কথাটা আমি জানি ; সেই অধিকারেই তো আমি মুখ খুলি। এর সুবিধা কত, আপনি তো দেখছেনই! যতই আমি আত্ম-নিন্দা বাড়াব, ততই অন্যকে বিচার করবার অধিকার আমার আসবে। এমন কি, এভাবে আপনাকে আমি

প্ররোচিত পর্যন্ত করি আত্ম-বিশ্লেষণ করতে। আর তাতে আমার কাজের ভার খানিকটা লাঘব হয় বই-কি। হায় বন্ধু, আমরা অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার উচ্ছন্নে যাওয়া জীব, সবাই। যদি আমরা কেবল নিজেদের অতীত জীবনের দিকে ফিরে দেখতে জানতাম, দেখতাম, সেখানে অবাক হবার, লজ্জায় মাথা কাটা যাবার মত উপাদানের অভাব নেই। দেখুন না, চেষ্টা করে! আপনার স্বগতোক্তির শ্রোতা হব আমি গভীর ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি নিয়ে।/

দোহাই, হাসবেন না। সত্যিই আপনি ভারি সেয়ানা খদ্দের। আগেই তা' বুঝেছিলাম আমি। তবে একদিন না একদিন আপনাকে মুখ খুলতেই হবে। অন্য খদ্দেররা বেশীর ভাগই বুদ্ধির চেয়ে আবেগেই সচরাচর চালিত হয়। তাদের নিরুৎসাহ করতে বেগ পেতে হয় না। বুদ্ধিমানদের নিয়েই একটু ঝামেলা পোয়াতে হয় প্রথম প্রথম। তাদের কাছে পদ্ধতিটা একবার বুঝিয়ে দিতে পারলেই ভাবনা চুকে যায়। পদ্ধতিটা তারা ভুলে যায় না; অহর্নিশি কথাগুলো তারা ভেবে ভেবে দেখে। আজ হোক, কাল হোক, খানিক খেলার ছলে, খানিক আবেগের তোড়ে, তারা মুখ খোলে, সব কথাই বলে ফেলে। আপনি কেবল বুদ্ধিই ধরেন না, বেশ বহু ঘাটের জল খাওয়া চেহারা আপনার। তবু স্বীকার করুন তো, পাঁচদিন আগে নিজের ওপর আপনার তৃপ্তি ছিল, আজ তা অনেকটা হ্রাস পায় নি কি? এখন আমার কাজ হবে আপনার চিঠির কিংবা আপনার ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে থাকা। আমি নিশ্চিন্ত, আপনি কথাটা বলবার জন্য ফিরেই আসবেন! ফিরে এসে দেখবেন, আমি অপরিবর্তিতই আছি। আর আমি বদলাতেই বা যাব কোন্ দুঃখে? আমার ঈপ্সিত সুখ তো আমি পেয়েই গিয়েছি। দ্বৈতাচার আমি মেনে নিয়েছি কোনরকম দুঃখের বালাই না রেখেই। বরং এর মাঝেই আমি গেড়েছি আমার বসত, আর পেয়ে গিয়েছি আমার জীবন-ভোর অন্বেষণের লক্ষ্যটুকু, আমার কাম্য স্বাচ্ছন্দ্য। অবশ্য

আমার অন্যায় হয়েছে আপনাকে বলা—বিচার এড়িয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে আদত লক্ষ্য ! আদত লক্ষ্য হল নিজেকে সবকিছু জুগিয়ে যেতে পারা, চাই কি দরাজ গলায় যদি নিজের পাপের কথা সর্বসমক্ষে স্বীকার করতে হয় তাতেও আপত্তি নেই। এখন আমি বিনা দ্বিধায়, কোন অট্টহাসির তোয়াক্কা না করেই, যা প্রাণে চায়, করি। আর আমায় পাল্টাতে হয় নি জীবনের পথ। এখনো তাই আমি নিজেকেই ভালবেসে চলি, চলি অন্যদের মাথায় হাত বুলিয়ে! তবে, আমার অপরাধের কথা প্রকাশ করে দেবার পর বেশ খোলসা মনে আবার আমি শুরু করতে পারি আমার পথ চলা, এক দ্বিমুখী উপভোগে গা ঢেলে দিয়ে। প্রথমত উপভোগ করি আমার প্রবৃত্তিগুলো আর দ্বিতীয়ত, মনোহর এক অনুতাপ।

আমার সমাধান পেয়ে যাবার পর, নারীই বলুন, গর্বই বলুন, বিরক্তি বলুন, ক্রোধ বলুন—সবকিছুতেই আমার রুচি ফিরে এসেছে, এমন কি এই যে আমার জ্বরটা বেড়ে চলেছে—তা-ও আমি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। শেষ পর্যন্ত আমারই জিৎ হল জীবন যুদ্ধে, এ জয় চিরস্থায়ী। আবার ফিরে পেয়েছি আমি একটি গিরিশৃঙ্গ যেখানে আমি ছাড়া নেই আর কেউ। এখান থেকে আমি পারি সকলের বিচার করতে। বহুদিন বাদে বাদে, সত্যকার সুন্দর কোন কোন রাতে আবার আমার কানে ধ্বনিত হয় দূরাগত ক্ষীণ এক অট্টহাসি ; সংশয় জন্মে আমার মনে। তখুনই আমি সবকিছুর ওপর চাপিয়ে দিই আমার অক্ষমতার বোঝা ; আবার তখুনি আমি হালকা মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠি।

তবে, আপনাকে আমি 'মেক্সিকো নগরী' হোটেলেই দেখব আশা করি ; যতদিন না আসেন, আপনার পথ চেয়েই আমি বসে থাকব। দোহাই, আমার কম্বলটা খুলে নিন; একটু দম নিতে চাই। আসবেন তো আপনি? আপনাকে আমি সবিস্তারে আমার টেকনিক বুঝিয়ে দেব ; ভারি মায়া পড়ে গিয়েছে আপনার ওপর।

দেখবেন, রাতের পর রাত আমি ওদের কানে মন্ত্র পড়ে চলেছি যে ওরা পাপী, ওরা পাপী। এই তো, আজ সন্ধ্যাবেলাতেই আবার শুরু হবে আমার কাজ। এমনই কাজটার নেশা যে তার লোভ সম্বরণ করতে আমি অপারগ, যতক্ষণ না দেখছি, মদে চুর্ হয়ে ওদের একজন না একজন আক্ষেপ করতে লেগেছে বুক চাপড়ে, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। বিশ্বাস করুন বন্ধু ঠিক তখনই আমি আমার বুক টান করে সোজা হয়ে উঠে বসি, মনে হয় আমি পর্বত-শিখর থেকে অবলোকন করছি দিগন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি। পরম পিতার মত সবার ওপরে নিজেকে তুলে ধরায় যে কী সুখ, মন্দ চরিত্র আর অভ্যাসের পরোয়ানা মানুষের হাতে গুঁজে দেবার মাঝেও একটা নেশা আছে। আমার ওলন্দাজ স্বর্গের শীর্ষে, দুষ্ট দেবদূতগণ পরিবেষ্টিত হয়ে সিংহাসনারূঢ় হয়ে দেখি আমি—জল আর কুয়াসা ভেদ করে আমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে চূড়ান্ত বিচার প্রার্থী মানবকুল, দলে দলে। অতি মন্থর তাদের আরোহণ। এর মধ্যেই আমি দেখছি, তাদের অগ্রদূত এসে পড়ছে। তার বিমূঢ় বয়ানের আধখানা একটা হাত দিয়ে ঢাকা ; আমি সেখানে পড়ছি মামুলি জীবনের দুঃখ আর তা এড়াতে না পারবার হতাশার গভীর ছাপ। আমি, আমি তাদের নিষ্কৃতি না দিলেও কৃপা করি, দয়া না করলেও বুঝি তাদের কথা, আর, সর্বোপরি বুঝি, এরা আমারই পূজা করছে!

হ্যাঁ, একটু পায়চারিই করি। ভাল রোগীর মত বিছানায় পড়ে থাকা কি আমার সাজে? আপনার চেয়ে ঊর্ধ্বে নিজেকে রাখতে চাই আমি, আর আমার মনই আমায় এনে দেয় উচ্চ ভাব। এমন সব রাতে, বলতে গেলে এমন সব সকালে (কারণ প্রত্যূষেই শুরু হয় পতন) আমি বের হই, পায়চারি করি দ্রুতপদে ক্যানালের তীর বরাবর। বিবর্ণ আকাশে পালকের স্তরগুলি সূক্ষ্মতর হয়ে ওঠে, পায়রাগুলো উড়ে যায় আরো উঁচুতে, বাড়ীর ছাতে ছাতে গোলাপী

এক উল্লাস এসে ঘোষণা করে যায়—আমার সৃষ্টির বুকে নতুন আর এক দিন সূচনার কথা। ভিজে হাওয়ায় ভেসে আসে দাম্‌রাকের বুকে প্রথম ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি, এই ইউরোপের সীমান্তে—যেখানে যুগপৎ শত শত, লক্ষ লক্ষ লোক, আমার প্রজারা, মুখভরতি এক তিক্ততার স্বাদ নিয়ে বহুকষ্টে বার হয় বিছানার বাইরে, নিরানন্দ চাকরির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে—এখানেই জাগে প্রথম জীবনের যে স্পন্দন, তারই হয় বোধন। তারপর, এই যে মহাদেশ আমারই পদ-লুণ্ঠিত ( নিজের অজ্ঞাতেই ), তার বহু উর্ধ্বে পক্ষ বিস্তার করে যেন উড়তে থাকি আমি সদ্যস্ফুচিত দিনের সুগন্ধি সুরাসিক্ত কিরণে স্নাত হয়ে, অশ্লীল কথার উন্মাদনায় বুঁদ হয়ে, এতেই আমি সুখী—ভারি সুখী আমি, বিশ্বাস করুন, এমন আপনার মনে যেন না হয় যে সুখী নই আমি; আমি সুখী, আ-মৃত্যু সুখী! ওই যে সূর্য, ওই বেলাভূমি, ট্রেড-উইণ্ডের পথবর্তী ওই যে দ্বীপগুলি, ওই যে যৌবন যার স্মৃতিতে মন ভরে ওঠে নিরাশায়!

মাফ করুন, আমায় বিছানায় ফিরে যেতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি; তবু আমি কাঁদছি না। এক এক সময় মানুষ ভালবাসে ভ্রাম্যমাণ হতে সব রকম সত্যের প্রতি সন্দিহান হয়ে, যতই সৎ জীবনের গোপন পন্থা সে আবিষ্কার করুক না কেন। সত্যি বলতে কি, আমার সমাধানটি আদৌ আদর্শ সমাধান নয়। কিন্তু যখন আপনি নিশ্চিত যে আপনি নিজের জীবনকেই ভালবাসেন না, জানেন যে জীবনের পর জীবন আপনাকে পরিবর্তিত হয়ে আসতে হবে, তখন আর বাছ-বিচারের তো প্রশ্নই ওঠে না; ওঠে কি? কি করলে মানুষ পারে আর কেউ হতে? অসম্ভব। একটা কেউ হবার কথাই মানুষকে ভুলে যেতে হবে, অন্য কেউ ভেবে ভুলে যেতে হবে নিজেকে, অন্তত একটি বার। কিন্তু কি ভাবে? দোহাই, আমার প্রতি অত কঠোর হবেন না। আমি সেই বুড়ো ভিখারীটার মত যে একদিন একটা কাকের সামনে

কিছুতেই আমার হাত ছাড়বে না, বলে, 'দোহাই মশাই, আমি নেহাৎই অকর্মা তা নয়, কিন্তু আপনি চলেছেন আলোর পথের খেই হারিয়ে।' সত্যিই, আমরা হারিয়ে ফেলেছি খেই আলোর পথের, সেইসব উষার পথের, সেইসব সন্তদের পুণ্য নিষ্পাপ চরিত্রের– যাঁরা জানতেন পরস্পরকে ক্ষমা করতে।

দেখুন, বরফ পড়ছে! না আমাকে বার হতেই হবে! শুভ্র রজনীতে নিদ্রিত আমস্টারডাম, ছোট্ট ছোট্ট তুষারাবৃত পুলের নীচে প্রবহমান গভীর নীলকান্ত খালগুলো, জনশূন্য পথঘাট, আমার চাপা পদধ্বনি—এই তো পবিত্রতা, যদিও ক্ষণিক, আগামী কাল কর্দমাক্ত হবার আগে পর্যন্ত। দেখুন, দেখুন, কি বড় বড় তুষারখণ্ড এসে আছড়ে পড়ছে জানলার কাঁচে। এ নিশ্চয় সেই পায়রাগুলো। ছোট্ট পাখীগুলো শেষ অবধি নেমে আসতে বাধ্য হল। জল আর ছাতের ওপর, সর্বত্র ওরা ছড়িয়ে দিচ্ছে অকুণ্ঠ পালকের রাশি। শোনা যাচ্ছে ওদের বিধুনন প্রতিটি বাতায়নে। কি আক্রমণ, বলুন তো! আশা করি, ওরা শুভ-সংবাদেরই বাণীবাহরূপে এসেছে। সবাই ত্রাণ পাবে, অ্যাঁ?—কেবল মাত্র বাছাই কয়জন নয়? পুঞ্জীভূত বিত্ত, কঠোর শ্রম, সবই ভাগাভাগি করে নিতে হবে আর আপনি, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আপনিই আমার বদলে আজ রাত থেকে শুরু করবেন মেঝেয় শুতে। ভারি মজার খেলা, না? আচ্ছা, স্বীকার করুন, আপনার দাঁতকপাটি লেগে যাবে, যদি এখনি দেখেন আমায় নিয়ে যাবার জন্য স্বর্গ থেকে রথ এসেছে, কিংবা, হঠাৎ যদি দেখেন বরফের বুকে দারুণ আগুন জ্বলতে? কি, আপনার বিশ্বাস হয় না? আমারো হয় না। তবু, আমার না বেরুলেই নয়।

বেশ, বেশ তো, আমি এবার মুখ বন্ধ করব, দোহাই, ক্ষুব্ধ হবেন না! আমার আবেগের প্রচ্ছুরণে কিংবা আমার প্রলাপে অত বেশী বিচলিত হবেন না। তাদের ওপর আমার যথেষ্ট প্রভাব আছে। বেশ, এইবার আপনি যখন নিজের জীবন সম্বন্ধে স্বগতোক্তি শুরু

করেছেন, তখন আমার বুঝতে দেরি হবে না—আমার ব্যক্তিগত স্বগতোক্তির প্রধান একটি উদ্দেশ্য সাধিত হল কিনা। সর্বদাই আমার আশা, যেন আমার প্রশ্নকর্তা পুলিশের লোক হয় যাতে করে 'ন্যায় বিচারকদের ছবি চুরির অপরাধে সে আমায় গ্রেফতার করে। তা নইলে, আর কোন অজুহাতে আমায় গ্রেফতার করে, সাধ্য কার, বলুন? কিন্তু চুরির ব্যাপারটা আইনের চৌহদ্দির ভেতরেই পড়ে, আর নিজেকে অভিযুক্তদের অন্যতম বলে কি করে পরিগণিত করব, মনে মনে তাও আমি ছকে রেখেছি। ছবিটা যে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছি আর যাকে খুশি এনে এনে দেখাচ্ছি—এই তো যথেষ্ট! আপনি তবে আমায় গ্রেফতার করবেন; বেশ নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হবে তা হলে। বাদবাকির দিকেও যথাক্রমে দৃষ্টি দেওয়া হবে আশা করি। ধরুন হয়তো আমার গর্দান নেওয়া হবে, আর, তা হলে তো মৃত্যুর ভয় আমার আর রইলই না। বেঁচে যাব আমি। সমবেত জনতার উর্ধ্বে তুলে ধরবেন আপনি নিস্পন্দ নিথর আমার মুণ্ডুটা; জনগণ মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠবে আমার মাঝে তাদের প্রতিচ্ছবি দেখে, আর আমি বিরাজ করব সবার ওপরে—দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সবকিছুই রূপ নেবে চরম পরিণতির; তা নয়তো অজ্ঞাত, অখ্যাত আমি কোন্ দিন সাঙ্গ করতাম আমার খণ্ড অবতারের জীবন কোন্ নির্জন কন্দরে কে-ই বা জানে?

তবে, আদৌ আপনি পুলিশের লোক নন; হলেই তো ঝামেলা চুকে যেত। কি বললেন? ঠিক, আমি ও কথাই অনুমান করেছিলাম। আপনার প্রতি তবে যে অদ্ভুত টান আমি অনুভব করছিলাম, তা যথার্থই সত্য! আপনি পারী-নগরীতে মহান্ ওকালতিতে হাত পাকাচ্ছেন? আমি আগেই আঁচ করেছিলাম, আমরা পরস্পর সমগোত্রের লোক। আমরা কি সবাই এক গোয়ালেরই গরু নই? অনবরত বকবক করে চলেছি, কার উদ্দেশ্যে করছি, সে হুঁশ নেই! একই প্রশ্ন করে চলেছি আমরা, যার উত্তর

আগে থেকেই জানি! তবে, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন, 'সেইন' নদীর জেটিতে আপনার কি হয়েছিল সেই রাতটিতে? আর, তবু আপনার জীবন অমন নিরাপদ রাখলেন কোন্ মন্ত্রবলে? আপনি নিজেই যে কথা বলেছিলেন তা আমি বছরের পর বছর ধরে ভুলতে পারি নি, রাতের পর রাত যা ঝড় তুলেছে আমার মনে, আর যা শেষঅবধি আপনার মুখ দিয়েই আমায় বলতে হবে: 'ওগো তরুণী, আবার তুমি ঝাঁপিয়ে পড় জলে, যাতে করে আর একটি বার আমি সুযোগ পাই আমাদের দু-জনকেই বাঁচাতে!' আর একটি বার, অ্যাঁ, কী বিপজ্জনক ইঙ্গিত! একবার ভেবে দেখুন তো, মনিব-বর, যদি আমাদের সত্যিই গ্রাস করে ফেলে? তা-হলে মুখ বুজে তা মেনে নিতেই হবে। ভর্র্র্...! উঃ, কি ঠাণ্ডা জল! না, না, চিন্তার কারণ নেই! বড় দেরি হয়ে গেল। চিরটা কাল বড় দেরিই হয়ে যাবে। ভাগ্যক্রমে!

---

# আলব্যার কাম্যু

প্যারিস : ৪ঠা জানুয়ারী—নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী সাহিত্যিক আলব্যার কাম্যু আজ এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

'রয়টার'

সারা বিশ্বের সাহিত্যানুরাগী অসংখ্য মানুষ সেদিন স্তব্ধ বিহ্বলতায় রয়টার প্রেরিত এই শোচনীয় সংবাদটি পাঠ করেছিল। তাদের অন্তরে তখন বুঝি বেজে উঠেছিল একটি কণ্ঠস্বর : যে মানুষ এখনও বয়সের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অপরিণত, যার একমাত্র সম্বল একটি জিজ্ঞাসু মন···তাকে সহসা খ্যাতির শীর্ষে এনে তুললে স্বভাবতই তার আতঙ্কিত হয়ে পড়ার কথা।

( নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে কাম্যুর প্রদত্ত ভাষণের অংশ বিশেষ )

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাত্র দু'টি বছর পরে ছেচল্লিশ বছরের জীবন-সন্ধানী এক প্রতিভা এইভাবে অকস্মাৎ অস্তলীন হয়ে গেল।

আলজেরিয়ায় অস্বচ্ছল পরিবারের এই সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ১৯১৩ সালের নভেম্বরে। অতি শৈশবেই তিনি হারিয়েছিলেন তাঁর পিতাকে। কিন্তু নানা অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে অনেক ওপরে একদিন তিনি উঠে আসতে পেরেছিলেন আপন সৃজনধর্মী প্রাণশক্তির প্রভাবে।

প্রেক্ষাগৃহ, সাংবাদিকতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল প্রতিভাশালী কাম্যুর সমান বিচরণ। নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধের ত্রি-স্রোতধারায় আপন সৃষ্টির প্রবাহকে অব্যাহত রেখেছিলেন, এই আত্মান্বেষী ফরাসী দার্শনিক। সংখ্যায় সীমিত তাঁর সৃষ্টি, কিন্তু জীবন-দর্শনের স্বকীয় মৌলিকত্বে সে সৃষ্টি বুদ্ধিজীবী মানুষের কাছে এক আশ্চর্য অনাস্বাদিত সংবেদন।

# পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্যাতনামা বিপ্লবী মহানায়ক শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) মহাশয়ের পৌত্র। আশৈশব পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অধিবাসী তিনি, এবং বর্তমানে সেখানে শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত। বাংলা, ফরাসী এবং ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য আর দেশী-বিদেশী সঙ্গীতের অনুরাগী তিনি।

তাঁর সাহিত্য-সাধনার শুরু কিশোর বয়স থেকেই। গত কয়েক বছরে প্রথম শ্রেণীর বহু বাংলা ও ইংরাজি পত্র-পত্রিকায় তাঁর উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও অজস্র কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। মূল ফরাসী থেকে উপন্যাস, কাব্যগ্রন্থ ও গল্পের অনুবাদে তিনি ইতিমধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর মৌলিক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'আলোর চকোর' এবং ইংরাজিতে লেখা A Rose Bud's Song দেশে-বিদেশে সমাদৃত। পার্লবাক, হ্যালডর ল্যাক্সনেস প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকদের বিশেষভাবে লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ করে তিনি ইতিপূর্বে 'আলোর কবি রবীন্দ্রনাথ' এবং স্যাঁজন পার্স, জাঁ ফিলিওজা, লুই জিলে, ফেলিসিয়েঁ শালে, আঁদ্রে জিদ, আঁদ্রে গ্যাব্রতিয়ের, স্যুজান্ কার্পেলেস, আঁদ্রে মোরোয়া প্রমুখ বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের প্রবন্ধের অনুবাদ করে 'ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ' নামে সঙ্কলন প্রণয়ন করেছেন।